তাকে পেতে গেলে তপস্যার জোর থাকা চাই। কিন্তু তেমন তপস্যা কি আমি করেছি যে···

নিশীথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারেই উত্তরার মুখের প্রত্যেকটা রেখা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিতে চেষ্টা করিল। উত্তরার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইলেও নিশীথ সম্পূর্ণভাবে তাহার অন্তরের পরিচয় পাইল না।···

দৃঢ় গলায় নিশীথ কহিল, কিন্তু এটাতো তোমাদের মত আধুনিক মেয়েদের মুখে মানায় না, উত্তরা? একি তোমার আন্তরিক কথা?

অকম্পিত গলায় উত্তরা কহিল, সত্যিই! আপনি আমাকে শুধু বিশ্বাস করুন,···সব মেয়েরাই সমান নয়, এ-টা তো জানেন?

নিশীথ ছাদের উপর এলোমেলো পায়ে একচক্র ঘুরিয়া আসিয়া কহিল,—আর আমি যদি এখন মাধবীকে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়ে ঘরে আনি? তাহ'লেও কি—

উত্তরা সাহস করিয়া চোখের অজস্র ধারাকে মুছিতে পারিতেছিল না, পাছে নিশীথের কাছে তাহার এই দুর্ব্বলতাটুকু ধরা পড়িয়া যায়! মুখ না তুলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে সে কহিল, তাহ'লেও আমি রাগ ক'রবো না। মানুষের মনের ওপর যে জোর খাটে না, আমি তা জানি।

অস্থির গলায় নিশীথ কহিল, জানো? আচ্ছা, উত্তরা, তুমি এখন ঘরে যাও, আমার এখন ঘুম আসবে না, খোলাছাদে আমি

একটুখানি একা থাকতে চাই। তোমার কথার জবাব আমি পরে ভেবে দেব।...

উত্তরা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু হিম লেগে আপনার তো শরীর খারাপ হ'তে পারে?

—না, না উত্তরা, তুমি ঘরে যাও—আমি বেশ আছি তোমারও অদৃষ্ট মন্দ, উত্তরা, নইলে—

উত্তরা আর দাঁড়াইল না, শিথিলপদে নিজের ঘরে গিয়া শূন্য শয্যাটার উপর লুটাইয়া পড়িল।

উত্তরার যে অদৃষ্ট মন্দ, নিশীথ কি তাহা এতদিনে বুঝিল!

তিন

শশুর বাড়ীতে উত্তরা সকলের নিকট হইতে অনাদর পাইলেও এক জায়গায় সে অপর্যাপ্ত স্নেহ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। পুত্রের চাইতে পুত্রবধুর প্রতিই নিশীথের পিতা জমিদার চন্দ্রনাথ চৌধুরীর আন্তরিক টানটা একটু বেশী দেখা যাইত। দুইটী কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহারা এখন নিজ-নিজ শশুরালয়ে সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত, কনিষ্ঠা কন্যা মিলি এখনও কৈশোরের সীমা অতিক্রম

করে নাই, তাহাকে শিশু বলিলেই চলে, পিতার সেবা করিবে কি···স্কুলের রক্তনেত্রা প্রবীণা শিক্ষয়িত্রীর শাসনের ভয়েতেই তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়; সুতরাং নিয়মিত পাঠাভ্যাস ও অবসরকালে বৌদিদির সহিত খুনসুটী বাধাইতেই তাহার সময় কাটিয়া যায়। গৃহিণীর একে বাতের শরীর, তাহার উপর বৃহৎ পরিজনের তত্ত্বাবধান করিতে হয়, স্বামীর সহিত প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন তিনি পারত-পক্ষে ও মহল মাড়ান না, সুতরাং উত্তরা ভিন্ন চন্দ্রনাথ চৌধুরীর মুখ চাহিতে এই এতবড় প্রাসাদে আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বহুস্থানে পাত্রী দেখিয়া ও বহু ঘর কুল-শীল বাছিয়া তিনি এই সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্তা শিক্ষিতা অতিরিক্ত নম্র স্বভাবা মেয়েটীকে পুত্রবধূর মর্য্যাদা দিয়া গৃহে আনিয়াছেন। উত্তরার পিতার সহিত বাল্যে যে তাহার বন্ধুত্ব ছিল, এই বিবাহ অনুষ্ঠানে তাহা সুদৃঢ় হইল এই কথাটাই উভয় বিগত-বয়স্ক বন্ধু সেইকালে ভাবিয়া সুখী হইয়াছিলেন। উত্তরার পিতা উত্তরাকে চন্দ্রনাথের হাতে সমর্পণ করিয়া যতটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; ঠিক ততটা নিশ্চিন্ততা চন্দ্রনাথ চৌধুরী অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারেন নাই। বিবাহসভায় চন্দন-চর্চ্চিত নিশীথের সুকুমার ললাটে চিন্তার ছায়া দেখিয়াই বুঝি বিচক্ষণ বৃদ্ধ ভবিষ্যতের ভাবনায় শিহরিয়া উঠিতে-ছিলেন।

বিবাহের পরেই যখন বধূর প্রতি পুত্রের বিমুখতা নির্ম্মমভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখন উত্তরার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া

চন্দ্রনাথ চৌধুরী যেন মরমে মরিয়া গেলেন। সেই হইতেই কাজে অকাজে উত্তরাকে নহিলে তাঁহার চলিত না।

উত্তরার শাশুড়ীর চোখে কিন্তু ইহা অতিরিক্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইত। সোনা ফেলিয়া শুষ্ক শূন্য-অঞ্চলে গ্রন্থি বাঁধিবার পাত্রী তিনি নন। তাঁহার আদরের নিশীথই যাহাকে সম্পূর্ণভাবে ছাঁটিয়া ফেলিতে চাহে, সেই অপয়া, অলক্ষণা বধূর প্রতি এত মমতা কেন? খোসামোদকারিণী আত্মীয়াদের প্রশ্নে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জবাব দেন, কর্ত্তার মতিচ্ছন্ন হয়েছে, ওই কালো পেত্নীর মত চেহারা কি আমার সোনার চাঁদের পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি!

গৃহিণীর পদসেবা করিতে করিতে একজন সেই মুহূর্ত্তে বলিয়া উঠে: তা, আর বলতে মা…রূপ তো নেই-…গড়নও তেমন নয়, কেমন যেন কাঠ-কাঠ…মুখছিরিও সুবিধে নয়…শুধু টাকা দেখে কর্ত্তামশায় ভুলে গেলেন।

গৃহিণী প্রত্যুত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহাকে বাধা দিয়া আর একজন বর্ষীয়সী দোক্তাপানের রসে গাল ভরিয়া ভারী গলায় উত্তর দিলেন, তুমি বাছা থামো। সব কাজে সরফরাজী করতে এসো না, চন্দরের আমার টাকার বুঝি অভাব পড়েছে? বলে, টাকার সিন্দুকে ছাতা ধরেছে, বনেদী ঘর, টাকার আবার কোনখানে কমতি আছে…চন্দর বৌমার বাপের ছোটবেলার বন্ধু ছিল কিনা, তাই ধেড়ে মেয়ে কোথাও গছাতে না পেরে বুড়ো চন্দরের হাতে পায়ে ধরে পড়েছিল…। আর চন্দরের দয়ার শরীল…না করতে পারলে না।

উত্তরার অদৃষ্ট

একটী অল্পবয়স্কা বিধবা মেয়ে বড়ীর ডাল বাছিতে বাছিতে মৃদু গলায় কহিল, নতুন বৌদিদির কথাবার্ত্তাগুলি কিন্তু ভারী মিষ্টি, না সেজ খুড়ী ?

সেজ খুড়ী প্রস্তুত হইযাই ছিলেন, হাত-মুখ নাড়িয়া খর খর করিয়া উঠিলেন : হ্যাঁ একেবারে মিছরীর পানা, যাকে বলে·· তুই ছুঁড়ী কাজ কচ্ছিস কাজ কর, সাতকূল খেয়ে এসব খবরে তোর কি দরকার ?

মেয়েটী ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া লইল। এ বাড়ীর মধ্যে উত্তরাই একমাত্র তাহার বেদনা বুঝিত বলিয়া সে উত্তরার স্বপক্ষে দুই একটা কথা বলিতে গিয়াছিল।

এ সমস্ত অপ্রীতিকর আলোচনা উত্তরার কান এড়াইয়া যাইত না···হয়তো উত্তরাকে সম্মুখে রাখিয়াই ইঁহারা বিষাক্ত শরগুলি বাছিয়া বাছিয়া নিক্ষেপ করিতেন। উত্তরা প্রস্তর প্রতিমার মত বসিয়া থাকিত। কোনদিন অত্যন্ত অসহ্যবোধ হইলে শশুরের সস্নেহ আহ্বানে সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িত ; পানের ডিবাটী হাতে লইয়া সে বাহিরে গেলেই শাশুড়ী মুখভঙ্গী করিয়া কহিতেন, ওই করেইতো মাথাটী ওর খেয়েছেন উনি। কিসের এত আদর রে বাপু··· আমার তো দুটী চক্ষু পেড়ে ওকে দেখতে ইচ্ছে করে না।

কথা শেষ হইতে না হইতেই একজন সুর ধরেন : তা আবার ইচ্ছে হয় গা··· ? বলে সোয়ামীতে হতাদর করলে তাকে দুনিয়ায় কেউ দেখতে পারে না···আবার দেমাকীর দেমাক কত। এত

শোনে, তবু একটু হুঁ কি হাঁ করে না…। কি জানি বাপু কেমনতর মেয়ে; চোখেও একফোঁটা জল কোন দিন দেখতে পাইনি।…আমরা হ'লে হাপুস চোগে কেঁদেই ভাসাতুম।

কিন্তু কাঁদিয়া বেদনা জানাইবে সে কাহার কাছে? কে তাহার কান্নার তাৎপর্য্য বুঝিয়া সস্নেহে তাহাকে সান্ত্বনার ছলে নিকটে টানিয়া লইবে। এ যে তাহার নিষ্ঠুর নির্ম্মম নিয়তি… ভাগ্য যাহার বিড়ম্বিত, সে কি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলেই অদৃষ্টের লিখন মুছিয়া ফেলিতে পারিবে?

উত্তরাকে বাহিরে কেহ দেখিলে বুঝিতে পারিবে না যে তাহার মনের-আকাশ অন্ধকার করিয়া কী ঝড় বহিতেছে।

পানের ডিবাটী সম্মুখস্থ টীপয়ের উপর রাখিয়া উত্তরা নম্রগলায় কহিল, আমাকে ডাকছিলেন বাবা?

সংবাদপত্রখানা শয্যার উপর ফেলিয়া চন্দ্রনাথ অর্দ্ধোত্থিতের ন্যায় বসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, হ্যাঁ, মা। তোমার খাওয়া হয়েছে?

—হয়েছে বাবা। আপনার কি পা টিপে দেব?

উত্তরার মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি ফেলিয়া বৃদ্ধ সনিশ্বাসে কহিলেন, না মা, পা টিপতে হবে না, তুমি এখানে একটু বসো, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাই মা।

উত্তরা বড় বড় চক্ষু মেলিয়া বিস্মিত গলায় কহিল, আমার সঙ্গে! কিসের পরামর্শ বাবা?

চন্দ্রনাথ চৌধুরী কুঞ্চিত ললাটে কহিলেন, বৌমা, একটা কথা তোমাকে আমি জিগ্যেস করবো, সত্যি জবাব দেবে তো মা?

উত্তরার ললাট ঘামিয়া উঠিল, সে নত মুখে কহিল, দোব বাবা, বলুন?

—নিশীথ তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না, না মা? লজ্জা করো না. সত্য জবাব দিও, আমার কাছে লুকিও না মা।

উত্তরা শশুরের প্রশ্নে প্রমাদ গণিল! এই প্রশ্নের কী সদুত্তর দেওয়া যায়, নিতান্ত নির্লজ্জের মত কি করিয়া বলা যায়, যে সে নিশীথের বিশাল অন্তরের এক পার্শ্বেও সামান্য এতটুকুও স্থান পায় নাই! স্বামীর বধূই হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে স্বামীর প্রিয়া নহে···এমন কি তাঁহার দুঃখ সুখের অংশভাগিনীও নহে। সে শুধু সংসারের দাবী মিটাইবার পাত্রী···শুদ্ধ, নামমাত্র নিশীথের বিবাহিতা পত্নী। মাত্র এইটুকু তাহার পরিচয়।

এই স্বল্প পরিচয়টুকু বুকে ধরিয়াই তাহাকে এই দীর্ঘ জীবন পাড়ি দিতে হইবে।

উত্তরা আস্তে আস্তে কহিল, তিনি তো কই কোনদিন আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন নি বাবা।

চন্দ্রনাথ চৌধুরী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, মাত্র এইটুকু জবাবেই কি তুমি তোমার বুড়ো ছেলেকে ঠকাতে পারবে মা? আচ্ছা, তোমার এখানে থাকতে কি কোন কষ্ট হচ্ছে মা?

উত্তরা মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছুই কষ্ট নেই বাবা, আমি তো বেশ আছি।

চন্দ্রনাথ গম্ভীর গলায় কহিলেন, তাহলে তোমার মু[illegible]সি কই মা? তোমার মত অল্প বয়সী মেয়েদের কথাবার্ত্তায় যে আনন্দ ফুটে বেরোয়. সে আনন্দ তোমার কই, এত সাড়ী, এত গহনা তোমার আছে, তুমি তো কখনো ব্যবহার করেছ বলে মনে পড়ে না···তোমায় কি তবে দগ্ধে মারতেই আমি তোমার বাপের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলুম মা? আমি যে অনেক আশা করেই নিশীথের বিবাহ দিয়েছিলুম·· কিন্তু···

উত্তরার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, এত স্নেহ, এত আদর, তবু তাহার অন্তর কেন হাহাকারে ভরিয়া উঠিতেছে, তবু কেন মনে হয়, সে কিছুই পায় নাই! যাহা পাইলে তাহার নারী হৃদয় কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সেই একমাত্র বস্তুর অভাবে তাহার সমস্তই বৃথা।

উত্তরা রুদ্ধ গলায় কহিল, ও-কথা বলবেন না বাবা, আমি এখানে খুব, খুবই সুখে আছি···এইতো আপনি যে মতি বসানো চুড়ী দিয়েছিলেন তা সব সময় পরে রয়েছি, আর এ সাড়ীখানাও তো খুব খারাপ নয়, তবু আপনি বলেন যে আমি কিছু পরি না।

চন্দ্রনাথ ব্যথিত গলায় কহিলেন, আমি সব বুঝি বউ-মা. কিন্তু চন্দ্রনাথ চৌধুরীর মনে যে কষ্ট দেয়, তাকে আমি কোনও দিনই ক্ষমা করতে পারবো না—সে আমার—

উত্তরা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, বাবা, চুপ করুন, আর কিছু বলবেন না।

—না বৌমা, আজ না হয়, তোমার অনুরোধে চুপ করলাম, কিন্তু—নাঃ, থাক···বৌমা তুমি আমার মাথাটায় একটু হাত বুলোও তো মা, মনটা বড় বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল।··

উত্তরা সজল চক্ষে ধীরে ধীরে শশুরের মাথার মধ্যে হাত বুলাইতে লাগিল।

চার

ঘর খোলাই ছিল, উত্তরা পর্দ্দা সরাইয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, নিশীথ অসময়ে সোফার উপর শুইয়া রহিয়াছে, দুই চক্ষু তাহার নিমীলিত।· নিশীথ উত্তরার আগমন সংবাদ পায় নাই, উত্তরা আসিয়াছিল নিঃশব্দে···নিশীথকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার নারীহৃদয় মমতায় ভরিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল সে নিকটে গিয়া নিশীথের মুখের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞাসা করেঃ কি হইয়াছে তোমার? কেন তুমি এমন করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছ. আমাকে কি তোমার অতখানি দুঃখের এতটুকুও ভাগ দিতে পারো না?

উত্তরা নিশ্চলভাবে টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, ঘর হইতে ইচ্ছা সত্ত্বেও নড়িতে পারিল না। তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, তাহারই জন্য একটী অমূল্য জীবন পলে পলে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

একটী ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস পড়িল, উত্তরা চমকিয়া উঠিল, নিশীথ অস্ফুট স্বরে 'মাঃ' বলিয়া চোখের উপর হইতে হাতখানি সরাইতেই অদূরে উত্তরার এক জোড়া ছলছলে চোখের ব্যাকুল দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিয়া গেল।

নিশীথ ক্লান্ত গলায় কহিল, কিছু বলবার আছে কি?

বলিবার নাই বা কি? বলিবার যাহা আছে তাহা কি নিশীথ শুনিবে?

উত্তরা মাথা নাড়িয়া কহিল, এসেছিলাম, আপনার ঘরখানা পরিস্কার করতে, জানতাম না আপনি ছিলেন···আমি যাই।

উত্তরা দুই পা অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল, অত্যন্ত সঙ্কোচভরে প্রশ্ন করিল; "আপনার কি কোন অসুখ করেছে?

নিশীথ শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, না।

—"অবেলায় শুয়েছিলেন দেখে তাই—

উত্তরার কথা বাধিয়া গেল, কি বলিবেই বা সে, নিশীথ তাহাকে এমন কিছু অধিকার দেয় নাই যে সেই অধিকারের জোরে কহিবে, দেহ ও মন যদি তোমার সুস্থই রহিবে, তবে এমন করিয়া বন্ধু স্বজন পরিত্যক্ত হইয়া নির্জ্জন ঘরে পড়িয়া রহিয়াছ কেন? কেনই বা তোমার দুই চক্ষের নিম্নে কাজলের রেখার মত কালী

পড়িয়াছে? আসিয়া পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যও তো তোমাকে দেখিলাম না প্রাণ খুলিয়া হাসিতে।"

নিশীথ অনুচ্চ গলায় ডাকিল, শোনো উত্তরা, যেও না।

উত্তরার অন্তর আলোড়িত করিয়া নিঃশ্বাসের ঝড় বহিয়া গেল। কম্পিত বুকে ফিরিয়া আসিয়া মৃদু স্বরে কহিল, ডাকলেন আমায়?

নিশীথ মুখ তুলিয়া কহিল, সেদিন বন্ধু হ'তে চেয়েছিলে উত্তরা, আজ তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

উত্তরা গাঢ় স্বরে কহিল, কি কথা বলুন, রাখবো।

তার বড় কান্না পাইতেছিল, নিশীথ তাহার সহিত যাচিয়া এত কথা কহিতেছে, এত সৌভাগ্য তাহার, ইহা কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে, না জাগ্রতই রহিয়াছে···উত্তরার অদৃষ্টে এত সুখ ছিল!

নিশীথ আস্তে আস্তে কহিল, আমি তোমাকে মুক্তি দিতে চাই উত্তরা, হ্যাঁ মুক্তিই, তুমি কেন আমার সঙ্গে থেকে কষ্ট পাও, জীবন আছে, জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে চায় সকলেই ···আমার সঙ্গে তোমার শুধু বিয়েই হয়েছে উত্তরা, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মিলন বলতে যা বোঝায়, তা আমাদের আদপেই হয়নি, সুতরাং এক হিসেবে তুমি আজও কুমারী···

উত্তরা এতক্ষণ বিস্ফারিত চোখে দাঁড়াইয়া ছিল, নিশীথের শেষ কথাটী কানে যাইতেই সে কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িল। তাহার পর ঊর্দ্ধমুখে সিক্ত গলায় কহিল, এসব কি বলছেন আমায়? কি শোনাবেন আপনি? আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

নিশীথ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, তোমাকে আমি বিবাহ-বন্ধন থেকে স্বেচ্ছায়, আনন্দের সঙ্গে মুক্তি দেব উত্তরা! আমি চাই তুমি আবার বিয়ে কোরো—মুখ ঢাকচো কেন উত্তরা? আজকাল তো মেয়েরা বন্ধন চায় না··· স্বামী ও সংসারকে তারা এক হিসেবে বিড়ম্বনা বলেই মনে করে। তবে? কাঁদছো কেন উত্তরা, কথাটা আমি মন্দ বলিনি, ভেবে দেখো:

উত্তরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া ছিল. নিশীথের কথায় হাত সরাইয়া আর্তকণ্ঠে কহিল, আপনি কি মানুষ?

নিশীথ একটু ম্লান ভাবে হাসিয়া কহিল, মানুষ বলেই তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের দিনগুলো স্মরণ করে শিউরে উঠছি···যদি বল হিন্দু-বিয়েতে ডাইভোর্স চলে না, কিন্তু আমি তো কখনো আমার দাবী নিয়ে দাঁড়াবো না উত্তরা, তোমার যেখানে খুসী যেতে পারো, যাকে ইচ্ছে বিয়ে করে সুখী হ'তে পারো। বন্ধু হিসেবেই তোমাকে সদুপদেশ দিচ্ছি উত্তরা, তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করিনি···।

উত্তরা ততক্ষণে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়াছে, আঁচলে চোখের জল মুছিয়া সে ভগ্ন গলায় কহিল, আপনার সদু-পদেশের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু হিন্দুর মেয়ে স্বামী অনুমতি দিলেও পত্যন্তর গ্রহণ করে না, এটা জানবেন। আমার অদৃষ্ট আমি বুঝবো, সে জন্যে কোনদিন আপনাকে দোষী করবো না, আপনি দয়া করে আমার বিষয় না ভাবলেই আমি সুখী হব,

মনে করুন উত্তরা বলে আপনি কাউকে জানেন না, চেনেন না...

চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। উত্তরা মাথার অবগুণ্ঠনটুকু ঈষৎ টানিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

নিশীথ যে তাহার মর্ম্মস্থলে এমন করিয়া আঘাত করিবে ইহা সে ভাবিয়া দেখে নাই।

বিকাল হইতে রাত্রের মধ্যে উত্তরা নিজের সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিল। রাত্রে সকলের আহারাদির পালা চুকাইয়া উত্তরা নিত্য দিবসের মত শশুরের শয্যাটী ঝাড়িয়া মুছিয়া, মশারী ফেলিয়া সহসা ধীরে ধীরে ডাকিল বাবা!

একখানি ডেক চেয়ারে অঙ্গ ঢালিয়া চন্দ্রনাথ চৌধুরী চিন্তিত মনে ধূমপান করিতেছিলেন। বধূর কোমল কণ্ঠস্বর কানে যাইতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। তারপর সস্নেহে কহিলেন, কি বলছ মা?

উত্তরা ভূমিতল ন্যস্ত নয়নে আর্দ্র গলায় কহিল, আমাকে একবার কাঞ্চনপুরে পাঠিয়ে দেবেন বাবা? অনেক দিন যাইনি···

চন্দ্রনাথ বিস্মিত গলায় কহিলেন, তবে যে মা তুমি বল্লে এখানে তোমার কোন কষ্টই নেই, তবে আবার যেতে চাইচ কেন?

উত্তরা লজ্জিত হইয়া অপ্রতিভ গলায় কহিল, কষ্ট তো নয় বাবা, অনেক দিন বাবাকে দেখিনি কি না···

চন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন, বেটীর এ বাবার সেবা করে করে বুঝি তৃপ্তি হচ্ছে না, না? আচ্ছা মা যেও। কিন্তু বেশী দিনের জন্যে নয়, মনে রেখো এখানেও তোমার একটী দুখের ছেলে আছে তাকে ফেলে তুমি যে দেরী করবে—সেটী হবে না।

উত্তরার মুখ স্নিগ্ধ হাস্যে ভরিয়া উঠিল, প্রীত গলায় কহিল, তা আমি কক্ষণোই ভুলবো না বাবা, তাহলে কবে আমায়—

চন্দ্রনাথ হাসিমুখে কহিলেন, তুমি কবে যেতে চাও, বলতো মা?

উত্তরা নিম্নদৃষ্টিতে কহিল, আমার কিছুই ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই বাবা, যেদিন আপনি বলবেন।

চন্দ্রনাথ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, তবে কালই যেও মা, দিনটাও ভাল, বুধবার, তবে এই সময় নদীপার হওয়া একটু ভয়ের কারণ, ঝড় উঠতে পারে।

উত্তরা মনে মনে কহিল, ঝড় উঠিলেই বা ক্ষতি কি। নৌকা ডুবিয়া তাহার যদি মৃত্যুই হয়, তাহা হইলেও উত্তরার ক্ষোভ নাই, নিষ্ফল জীবনের সমাপ্তি যত শীঘ্র ঘটে, ততই মঙ্গল।

নিজের ঘরে আসিয়া উত্তরা বাতি নিভাইয়া শুইয়া পড়িল। শয্যাপার্শ্বে মিলি অঘোরে ঘুমাইতেছে। মিলির কোমল মুখে ও ললাটে অপূর্ব্ব প্রশান্তি···উত্তরা তাহাকে একহাতে বেষ্টন করিয়া তাহার রেশম-কোমল চুলের উপর মুখ রাখিয়া অস্ফুট গলায় কহিল, তুমি জীবনে সুখী হইও বোন, স্বামীর আদরিণী

প্রিয়া হইও...আমার মত দুর্ভাগ্য যেন তোমার কোনদিন না আসে।

খোলা জানালা দিয়া নিশীথের ঘরের আলোটুকু দেখা যাইতেছিল, উত্তরা সেইদিকে অশ্রুভরা চোখে চাহিয়া কহিল, তুমিও সুখী হইও, তোমারই সুখের নিমিত্ত এত আদর, এত মমতা ছাড়িয়া আমি চলিলাম...জীবনে যাহাকে নিকটে পাইলেনা বলিয়া দুঃখ করিতেছ, প্রার্থনা করি, তোমার কামনা সফলতায় ভরিয়া উঠুক। তুমি সুখী হইয়াছ, দূর হইতে শুনিয়াও আমি তৃপ্তি পাইব।

রাত্রির অন্ধকার আকাশ জুড়িয়া নামিয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণ-পক্ষের গাঢ় অন্ধকারময়ী রাত্রি...জমাট কালো। উত্তরার মনের আকাশের মতই সূচীভেদ্য অন্ধকার, দিক-চিহ্নহীন... উত্তরা বালিশের উপর মুখ লুকাইল। এই সংসার ছাড়িয়া যাইতেও তাহার দুর্ব্বল মন ক্ষণে ক্ষণে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহাকে যে যাইতেই হইবে। সে না পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে তাহার জীবনদেবতা তো সুখী হইবে না! ভালবাসা যে জায়গায় একেবারে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, সেখানে কি শক্তি দিয়া উত্তরা সেই মিথ্যাকে বাঁধিবে?

পাঁচ

উত্তরার পিত্রালয়ে যাইবার কথা শুনিল সকলেই—নিশীথও শুনিল। নিশীথের মনে অনুকম্পা জাগিল, বেচারী, এখানে আসিয়া একটী দিনের তরে সুখী হইতে পারে নাই, তাই পিতার জন্য মন কাঁদিয়াছে, যাক, তবু কিছুদিনের জন্যও উত্তরা একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচুক।...

উত্তরা আপনার ট্রাঙ্কের চাবী শাশুড়ীর হাতে দিয়া কহিল, এটা আপনিই রেখে দিন মা, বেশীদিনতো থাকবো না, মিথ্যে কতকগুলো জিনিষপত্র নিয়ে গিয়ে কি করবো...তাছাড়া, সেটা একেবারে নিছক পাড়াগাঁ...এত দামী গহনাতেও দরকার নেই মা, এসব তুলে রাখুন।

শাশুড়ী বধূর যুক্তি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; মনে মনে কহিলেন, হাজার হউক লেখাপড়া-জানা মেয়ে তো, বুদ্ধি আছে। মুখে বলিলেন, তা কি হয় বৌমা, এত বড় ঘরের বউ যাবে বাপের বাড়ী, এমনি হা-ঘরের দশা হ'য়ে, তোমার শশুর শুনলে রাগ ক'রবেন বাছা।...

উত্তরা মিনতি করিয়া কহিল, বাবাকে আপনি জানাবেন না মা, শুধু এই চুড়ী ক'গাছা আর সরু হারটা পরে যাচ্ছি।

মিলি ছুটিয়া আসিয়া উত্তরাকে জড়াইয়া ধরিল: বৌদি, তুমি নাকি চলে যাচ্ছ? আর আসবে না?

শাশুড়ী তিরস্কারের স্বরে কহিলেন; মেয়ের কথার ধরণ দেখো, ষাঠ্ আসবে নাতো কি! এই ঘর জন্ম জন্ম করুক...। বাপের বাড়ী যেতে কি ইচ্ছে হয় না রে?

উত্তরা মিলিকে সস্নেহে বেষ্টন করিয়া কহিল, আসব বই কি ভাই, তোমাদের ছেড়ে কি বেশীদিন থাকতে পারবো?

মিলি স্ফুরিত অধরে কহিল, তবে না-ই বা গেলে?

উত্তরা হাসিয়া ফেলিল, মিলির কপোল দুইটী সাদরে টিপিয়া কহিল, আমার বুঝি বাবাকে দেখতে ইচ্ছে যায় না?

মিলি চোখের জল চাপিতে চাপিতে কহিল, আচ্ছা! যদি শীগগীর না ফিরে এস, তাহ'লে তোমার সঙ্গে আড়ি...জন্মের শোধ—

মিলি আর দাঁড়াইল না, হাতের উল্টাপিঠ দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপায়ে নীচে নামিয়া গেল।

যাত্রার সময় আসন্ন হইতে লাগিল যত, ততই উত্তরার মন যেন হাহাকার করিতে লাগিল। কেন এই কষ্ট, এত মমতা, উত্তরাকে কেহ তো বিদায় করিয়া দেয় নাই...উত্তরা তো স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইতেছে...। ইহারা জানে উত্তরা আবার ফিরিয়া আসিবে। মন শান্ত হইলেই আবার চলিয়া আসিবে এই স্বর্ণ পিঞ্জরে। কিন্তু উত্তরার মনতো জানে!

নিশীথ কি কাজে একবার তাহার শয়ন কক্ষে ঢুকিয়াই

বিস্মিত হইয়া গেল। উত্তরা তাহার শয্যার উপর মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, কান্নার আবেগে তার সমস্ত শরীর নদীর জলের মত অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

নির্ব্বাক নিশীথের মুখ দিয়া কথা সরিল না, ভাল না বাসিলেও একটী দুর্ভাগা নারীর কান্নায় যে কোনও পুরুষের চিত্ত কারুণ্যে ভরিয়া ওঠে, মায়াতুর বক্ষ উদ্বেল হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চাহে…কিন্তু, দুইটা শুষ্ক নির্ব্বাচিত সান্ত্বনা-বাক্যে উত্তরার মনোবেদনার কতটুকু লাঘব হইতে পারে…। উত্তরার এই অদৃষ্টের জন্য সে-তো একা দায়ী নহে, তাহার পিতা-মাতাই সম্পূর্ণ রূপে উত্তরার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, অপরাধ যদি কাহারও হয়, তাহা হইলে তাঁহাদেরই…নিশীথের ইহাতে কোন হাত নাই।

নিশীথ যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনিই ফিরিয়া গেল, উত্তরা জানিতেও পারিল না যে, যাহার ঘরে সে চুপিচুপি তস্করের মত ঢুকিয়া এই অমূল্য সম্পদটুকু লুণ্ঠন করিয়া লইল, সেই নির্ম্মম হৃদয়হীন পুরুষ তাহারই অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার এই মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাটুকু তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই।

… … …

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে উত্তরা অবসন্নের মত জানালার উপর মাথাটী রাখিল। আসিবার সময় সে নিশীথের দেখা পায় নাই, দাসী গিয়া খবর আনিল, দাদাবাবু বহুপূর্ব্বে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন।

বলিবার কিছুই নাই, উত্তরা এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছে যে যাত্রার পূর্ব্বে প্রিয়মুখ দর্শন করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবে।

পুরাতন দাসী বিন্দি উত্তরার সঙ্গে আসিয়াছিল, ট্রেন ছাড়িতে সে দুই পা ছড়াইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া বসিয়া কহিল দাদাবাবুর কি আক্কেল গা, যাবার বেলায় একবার দেখাটা কল্লে ক নি···হ্যাঁগা, বউমা তুমি যে আসছ, তা দাদাবাবুর মত আছে তো? আর থাকবে নাই বা কেন, বউ তো হয়েছে ওনার আপদ; দুটী চোখের বালাই···ঘরের বাহিরে গেলেই তো উনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন···। ধন্যি মা কলিকাল, হ্যাঁগো বউমা, আসবার সময় তো কিচ্ছুটী মুখে করনি; খাবারের বাক্স খুলবো।

উত্তরা মাথা নাড়িয়া অসহিষ্ণু গলায় কহিল, না বিন্দি, গাড়ীতে আমি কখনই খাই না. মিথ্যে এত খাবার এনেছ।

—ও-মা! বিন্দি অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া কহিল, আপুনি মা খেলে এত মেঠাই-মণ্ডা কে খাবেক! আর কেনই বা খাবে না···এয়োস্ত্রী মানুষ, অত বাছ-বিচের কেন গা?

উত্তরা মুখ ফিরাইয়া কহিল, কিছুই না, খাবার নষ্ট হয় যদি মনে কর, তা-হ'লে পাশের গাড়ীতে সরকার মশাই আছে, তাঁকে দিও আর তুমি খেয়ো···আমি একেবারে ওখানে গিয়েই জল খাব বিন্দি।

বিন্দি মুখভঙ্গী করিয়া উঠিল ; কে জানে বাপু…তোমাদের ব্যাপার যেন সবই কেমন তর। …বিন্দির এত নোলা নয়, অতগুলো মানষের খোরাক একাই খাবে।

বিন্দি আপনমনে অনেকক্ষণ বক বক করিল। তাহার পর গায়ের চাদরখানি গুটাইয়া মাথায় দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, পোড়া গাড়ী চড়লেই ঢুলুনীতে ঘুম আসে বাপু…বউমা, তুমি একটু গড়িয়ে নাও না গা ?

উত্তরা বিন্দির দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ গলায় কহিল, এখন শোবনা বিন্দি, ঘুম যদি পায় তো শোবো, তুমি ঘুমোও।

উত্তরা আবার জানালার বাহিরে তাকাল। গাড়ীতে যদিও ভীড় বেশী নাই, তবুও মেয়ে-কামরা ; নানা জাতীয়, নানা বয়সী মেয়েদের কলগুঞ্জনে মুখরিত। উত্তরার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উত্তরা সেই যে বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল, তাহাকে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত কেহ ফিরিতে দেখে নাই।

অন্ধকার ভেদ করিয়া যন্ত্রযান ছুটিতেছে…প্রেতের মত সারি সারি গাছপালা দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, মাঝে মাঝে দুই একটা জোনাকী ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করিয়াও নিজেকে প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছে…ছায়াছন্ন ধরণী… এই ধরণীর দিকে-দিকে হাসি ও কান্নার বিরাট অভিনয় চলিতেছে …মানুষের মন লইয়া, জীবন লইয়া চলিতেছে নির্ম্মম নিষ্ঠুর খেলা।

অদ্ভুত ভগবান। ...

না উত্তরা আর ফিরিয়া আসিবে না, নিশীথের জীবনপথে সে তো ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই, হইয়াছে কাঁটা...কাজ কি তাহার ফিরিয়া!

ঘুম নহে, তন্দ্রার আবেশে উত্তরার দুইটী চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছে মাত্র, সহসা অতর্কিতে প্রচণ্ড শব্দ করিয়া গাড়ীখানা লাইনচ্যুত হইয়া হেলিয়া পড়িল, হাজার হাজার দৈত্য যেন একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মাথায় ও বুকে দারুণ আঘাত পাইয়া উত্তরা চৈতন্য হারাইল, তাহার কাণের কাছে শত শত অসহায় আর্ত্ত মানবের করুণ বিলাপ তখনও ঝি ঝি পোকার একটানা সুরের মত আবর্ত্তিত হইতেছিল।

তাহার পর উত্তরার আর মনে নাই।

ছয়

মাধবীর যাহা কিছু ছিল মনে মনে…বাহিরে সে ছিল নির্লিপ্ত, নিশীথের দেশে তাহার মামাবাড়ী, সেই সূত্রে মাধবীর সহিত নিশীথের পরিচয়…প্রথম পরিচয়টুকু বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করিতে বিশেষ বিলম্ব ঘটে নাই…নিশীথ তখনও অবিবাহিত। তাহার উপর শুষ্ক গ্রন্থ-কীট নিশীথ এ পর্য্যন্ত কোনও অল্প বয়সী মেয়েদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। সেই নিশীথ দেখিল মাধবীকে, মাধবীর সহজ-সরল ব্যবহারের মাধুর্য্যে তার মন মুগ্ধ হইল, অন্তরে নূতন নিবিড় রসের সঞ্চার হইল…

দুইটী তৃষিত অন্তর যখন মিলনের আনন্দে সমস্ত পৃথিবীকেই অপূর্ব্ব দেখে, প্রতিটী ইন্দ্রিয় উন্মুখ হইয়া উঠে আর একজনের পদধ্বনির আশায়, তখন তাহারা জাতি-ধর্ম্ম কিছুই ভাবিয়া দেখে না, শুধু দিবা রাত্রি উষ্ণ সন্ধ্যার ছবি বিচিত্রতর হইয়া তাহাদের সূক্ষ্ম রসানুভূতিকে জাগাইয়া রাখে…। মাধবী যদিও কলিকাতায় ইঙ্গবঙ্গ অনেক পরিবারেই মিশিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং অনেক মুগ্ধ ভক্তই তাহার আরক্ত চরণপদ্মে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত মাধবীর বিমুখ চিত্তকে নাড়া দিবার ক্ষমতা কেহই পায় নাই, মাধবীর মত মেয়ে নিজেকে

লইয়াই নিজে সম্পূর্ণ। সেই আশ্চর্য্য মেয়ে মাধবীও যখন নিশীথের প্রেমমুগ্ধ অন্তরের পরিচয় পাইল, তখন সেই আবিষ্কারের আনন্দে মাধবীর মন রঙে রসে উজ্জল মধুর হইয়া উঠিল।

মানুষের মনের দ্বারে যখন এইরকম আনন্দের বার্ত্তা আসিয়া পৌঁছায়, সেই পরম শুভলগ্নে তখন মানুষ আত্মহারা হইয়া যায়, জীবনের সেই মহাক্ষণে নিশীথ মাধবীর কানে কানে যে অমৃত মধুর কথাগুলি বলিয়াছিল। এই ঘাত প্রতিঘাতে ভরা দুর্দ্দিনে হয়তো নিশীথ বিস্মৃত হইয়াছে, কিন্তু মাধবীর অন্তরপট হইতে সেই সোণার অক্ষরগুলি মুছিয়া আসিতেছে কই!

যে মন লইয়া মাধবী মামাবাড়ী অবকাশ যাপনের জন্য গিয়াছিল, সেই সদা প্রফুল্ল মনটীকে লইয়া আর কলিকাতায় ফিরিতে পারিল না, মনটীকে সে ফেলিয়া আসিল নিশীথেরই প্রশান্ত মূর্ত্তির চারিপাশে···আর যেখানে তাহাদের প্রথম চারিচক্ষুর মিলন ঘটিয়াছিল,—কোন শুভ অনুষ্ঠানের মধ্যে নহে, গান বাজনা, আলো সজ্জা তার কিছুই সমারোহ ছিল না, সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে, কালো দিঘীর ছল্‌ছল্‌ করা জলের ধারে ঘাটের উপর বসিয়া সেইদিন উভয়ে কোন কথা কহে নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের চারিটী চক্ষু ও দুইখানি যুগ্ম হাত বুঝি অনির্ব্বচনীয় আবেগে অন্তরের ভাব প্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

কলিকাতার এই বদ্ধ আবেষ্টনী আর তাহার ভালো লাগে না, প্রাণ যেন হাঁফাইয়া উঠে, মনে হয় ছুটিয়া সে পল্লীর শান্ত কোমল বুকটীতে ফিরিয়া যায়, সেখানে সিনেমা হাউস, ট্রাম-

বাস, সহরের যাবতীয় সুখ-সুবিধা নাই সত্য, কিন্তু যাহা আছে তাহা কলিকাতা মহানগরীতে মূল্য দিয়াও কিনিতে পাওয়া যায় না…। নদীর কালো জল, সুবিস্তৃত ধানক্ষেত, সবুজ অরণ্য… মাথার উপর শুভ্র বকের ঝাঁক, সেই স্মৃতি মাধবীর বুকে যেন সোনার মত জ্বলজ্বল করিতেছে…।…আবার সে কবে ফিরিয়া যাইবে?

তাহার এই মানসিক চাঞ্চল্য আর কাহারও চোখে ধরা পড়িল না কিন্তু রাঙা মাসীমা একদিন মাধবীকে কাছে টানিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, এমন হচ্ছিস কেন বল্‌তো মাধু? আমার মনে হচ্ছে তোর জীবনে যেন মস্ত বড় একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে?

মাধবীর মুখ অকস্মাৎ রক্তাভ হইয়া উঠিল। রাঙা মাসীমা অল্প বয়সে স্বামী হারাইয়া তাহাদেরই বাড়ীতে বসবাস করিতে-ছেন, অল্প বয়স তাহাতে শশুরবাড়ী; অভিভাবক বলিতে কেহ নাই, মাধবীর মা তাই তাহাকে জোর করিয়া কাছে আনিয়া রাখিয়াছেন। এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী মেয়েটীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিবার জো নাই। রাঙা মাসীমার প্রশ্নে মাধবী আলগোছে একটা উত্তর দিল, কই, কিছুই তো হয় নি?

—কিছুই হয় নি! দুষ্টু মেয়ে, তুমি আমার কাছে লুকোতে চাও …? রাঙা মাসীমার দুইটী চক্ষু কৌতূহলে ঝলমল করিতে লাগিল।

মাধবী রাঙা মাসীমার প্রশ্ন এড়াইয়া শুধু একটু হাসিল।

রাঙা মাসীমা কোমল গলায় বলিলেন, ছেলে বয়স, নিতান্তই ছেলে বয়স তাই বলচি···এখন যদি ভুল করে ভুল পথে চলিস মা, তাহ'লে সারাজীবনটায় আর শান্তির লেশমাত্রও খুঁজে পাবি না ···।

মাধবী রেলিংটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, আর যদি সেটা ভুলপথ না হয়ে সোজা পথই হয়, রাঙা মাসীমা ?

রাঙা মাসীমা হাসিমুখেই কহিলেন, সে-কি এখনই বুঝতে পারবি ? আগুনে না পুড়লে খাঁটি সোনাকে চেনা যায় না··· ওপরটায় উজ্জ্বল দেখে অনেকেই এইরকম করে ঠকে। শেষে সারাজীবন তার কেটে যায় চোখের জল ফেলে।

মাধবী কহিল, রাঙা মাসীমা, তুমি বড় শক্ত শক্ত কথা কও। পৃথিবীতে সবাই কি হারে ? পরাজয় কি সবারই ঘটে ? সব জিনিষেরই তো দু'টো দিক আছে মাসীমা ?

রাঙা মাসীমা বড় বড় চোখে অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া পরে মৃদু গলায় কহিলেন, আমি কেবল ভাবচি মাধু, দুদিনের সেই লাজুক মেয়ে মাধবীর মুখে এত ভাষা জোগালো কে ? তোর কথার জবাব দোব পরে, এখন রান্নাঘরে দিদি ডাকচেন, যাই।

রাঙা মাসীমা অদৃশ্য হইলে মাধবী রেলিং ধরিয়া শুব্ধ নীলাকাশের পানে চাহিয়া রহিল। সত্য এত কথা ইতিপূর্ব্বে রাঙা মাসীমার সহিত সে কহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মাধবীর বুঝি নবজন্ম হইয়াছে।

কিন্তু পুরুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেন? নিশীথ যে তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, প্রতি সপ্তাহে একখানি করিয়া সে তাহাকে পত্র দিবে…এবং মাধবীর এক একখানি পত্র তাহার সমস্ত দিবসের আনন্দসম্ভার বহন করিয়া তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে।

এই বুঝি নিশীথ তোমার প্রতিশ্রুতি রাখা! মেয়েদের মন লইয়া অবশেষে তুমিও নিষ্ঠুর খেলা খেলিতেছ? না দিলে একখানি পত্র, না দিলে তোমার কুশল সংবাদ, মাধবী তবে কি লইয়া থাকে? তবে কি সেই-ই নির্লজ্জের মত নিশীথকে পত্র দিবে! ছিঃ!

*　　*　　*

দ্বিধাগ্রস্ত মন লইয়া বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি একে একে কাটিতে লাগিল। নিয়মমত কলেজ যাওয়া ও সপ্তাহে দুইদিন করিয়া পিয়ানোর ধারে বসিয়া টুং টাং করিয়া নূতন গৎ আয়ত্ব করা, ইহা ছাড়া তাহার আর কি-ই-বা কাজ? তবুও ইহারই ভিতর তাহার চক্ষু, কর্ণ ও মন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, একখানি নীলাভ পুরু লেফাফায় মোড়া প্রিয়-প্রেরিত পত্রের জন্য।

অবশেষে সেই পত্র আসিলও, মাধবীর-ই নামে, কিন্তু সে আনন্দের বার্ত্তা বহন করিয়া আসে নাই, আসিয়াছে দুঃসংবাদ লইয়া।

মাধবীর মামাতো-বোন সুধা লিখিয়াছে :—

০　০　০　অনেক কথাই বলবার আছে দিদি, তুমি তো সেই নিশীথবাবুকে জানো? যিনি একদিন আমাদের

চড়ুই ভাতির নেমন্তন্ন রাখতে এসে নিজেই কোমর বেঁধে খিচুড়ীর হাঁড়ী চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর এই গত অঘ্রাণের সাতাশে বিয়ে হয়ে গেল। বউ কিন্তু বাপু ভাল হয় নি, কালো। কিন্তু মুখখানা দিদি ভারী চমৎকার! যেন লক্ষ্মীঠাকরুণ। · বৌদিও গিছলেন, বৌদি মার কাছে বলছিলেন, নিশীথবাবুর নাকি এ বিয়েতে মত ছিল না, ওঁরা সব জোর করে দিয়েছেন। তুমি থাকলে কী মজা হত, তুমিও বউ দেখতে যেতে? তুমি আবার কবে আসবে দিদিভাই?…

মাধবী চিঠিখানা মুঠার ভিতর শক্ত করিয়া চাপিয়া বসিয়া রহিল। সুধার চিঠিখানা ভালো করিয়া পড়াও হইল না। তাঁহার আর পড়িবার শক্তিও নাই …। দিনের আলো অকস্মাৎ ম্লান হইয়া আসিতেছে … তাহার চোখের সুমুখে যেন একখানি ভারী কালো রঙের পর্দ্দা নামিয়া আসিতেছে …। যে বিশ্বাস লইয়া সে দিনের পর দিন গণিয়া যাইতেছিল, সেই বিশ্বাসের মূল তাহার এত শীঘ্র শিথিল হইয়া গেল!

বিরহের বাঁশী শুধু নহে, বিচ্ছেদের বাঁশীই এইবার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজিতেছে!

সাত

দীর্ঘ একুশ দিনের পর উত্তরার জ্ঞান হইল।

চোখ মেলিয়া সে প্রথমে ক্ষীণ অস্পষ্ট গলায় ডাকিল—বিন্দি…।

শিয়রের ধারে ছোট্ট একটী টেবিলের সুমুখে দাঁড়াইয়া একটী প্রিয়দর্শন যুবক কতকগুলি ঔষধপূর্ণ শিশি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। তাহার ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত, মুখে চিন্তার ছায়া… চোখে মোটা সেলের চশমা…।

উত্তরার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর কাণে যাইতেই যুবকটী চমকাইয়া ফিরিয়া দেখিল, উত্তরা কাহাকে যেন খুঁজিতেছে, দৃষ্টি যদিও ঘোলাটে তবুও সেই নিষ্প্রভ দৃষ্টি যেন কাহাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

যুবকটী সরিয়া খাট ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কোমলস্বরে কহিল, কাকে খুঁজছেন বলুন তো?

—বিন্দি…বিন্দি ঝী-কে; আমাকে সে কোথায় এনেছে… আপনি কে?

উত্তরা আবার অবসন্ন হইয়া পড়িল। যুবকটী ত্বরিৎপদে বাহিরের বারান্দায় গিয়া অনুচ্চগলায় ডাকিল: সাধন!

পাশের ঘর হইতে একটী অল্পবয়সী ছোকরা বাহিরে আসিতেই যুবকটী আদেশের স্বরে কহিল, ষ্টোভ জ্বলচে তো? শীগগীর একটা প্যানে করে খানিকটা গরম জল চড়িয়ে দাও···মেয়েটীর দেখচি এতদিন পরে জ্ঞান ফিরে এসেচে।

যুবকটী আবার ঘরে আসিয়া উত্তরার খাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। একমুঠা বাসীফুলের মত উত্তরার শুষ্ক ম্লান শীর্ণ দেহখানি শয্যার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, কে বলিবে এই সেই উত্তরা··· সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা···শুধু প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ করিতেছে, সেই স্পন্দনটুকুতেই এতদিন বোঝা গিয়াছিল, যে উত্তরা বাঁচিয়াই রহিয়াছে।

রুক্ষ চুলগুলি কপাল হইতে সরাইয়া যুবকটী তাহার ললাটে হাত রাখিয়া তাপ গ্রহণ করিল।

উত্তরা সেই কোমলস্পর্শে আবার যেন জাগিয়া উঠিল। মুখে একটা দারুণ বিরক্তির চিহ্ন ফুটাইয়া ঈষৎ তীব্রগলায় কহিল, কেন আমার ঘুম ভাঙাচ্ছেন? আঃ···

যুবকটী সস্নেহে কহিল, আর ঘুমোয় না, এবার একটু মুখ খুলুন দেখি, এই জিনিষটুকু খাইয়ে দিই!

সাধন আসিয়া ইতিমধ্যে গ্লুকোস্ ওয়াটারের পাত্র তাহার হাতে দিয়া গিয়াছিল। উত্তরা তবুও জাগিল না, আচ্ছন্নের মত চক্ষু নিমীলিত করিয়াই পড়িয়া রহিল···

সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে, নিশীথ আসিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ও তাহার রুক্ষ অলকরাজির ভিতর মৃদুমৃদু

অঙ্গুলীচালনা করিতেছে। আঃ কী সুখের স্বপ্ন, কী গভীর পরিতৃপ্তি···এই মধুর ঘুম যেন তার আর না ভাঙ্গে···।

—মুখটা খুলুন, লক্ষীটী—।

যুবকের মিনতিপূর্ণ স্বরে উত্তরা আবার চাহিয়া দেখিল। ধীরে ধীরে তাহার যেন মনে হইল এই ঘর তাহার পরিচিত নহে এই শয্যা. এই গৃহ, তাহার উপর ওই সৌম্যদর্শন ভদ্রলোকটী ইহার কাহারও সহিত উত্তরার জীবনে পরিচয় ঘটে নাই। তবে—? উত্তরাকে তবে এখানে কে লইয়া আসিল? তাহার শয্যাপার্শ্বে তো শুইয়া থাকিত মিলি—সে কোথায়? মিলি কই? বিন্দি কই! তবে কি সে মরিয়া গিয়াছে···।

উত্তরা সহসা অস্থির গলায় বলিয়া উঠিল, আপনি কে, আগে বলুন না? যুবকটী মৃদুগলায় কহিল, আমি ডাক্তার। এবার ওষুধটা খেয়ে ফেলুন, দেখুন কখন থেকে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি।

ডাক্তার! উত্তরা আর কিছু না বলিয়া গ্লুকোসটুকু পান করিয়া ফেলিল। যুবক তৃপ্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, আর আপনার কোন ভয় নেই, এবার আপনি খুব শীগ্‌গীর সেরে উঠবেন। আচ্ছা, এবার চুপ করে শুয়ে থাকুন, আমি আসচি।···

সারা রাত্রিটা এইভাবেই কাটিল। সকালের আলোয় উত্তরা যখন পুনরায় চোখ মেলিল, তখন দৃষ্টি বেশ স্বচ্ছ···মুখের ভাবও অনেকটা সুস্থতার পরিচয় দিতেছে।

বিস্ফারিত চোখে চারিদিকে দেখিতে দেখিতে উত্তরা সহসা কাঁদিয়া উঠিল: কেন আপনি আমাকে বাঁচালেন?

যুবকটী মানে ডাক্তার দিবাকর মিত্র। হাসিমুখে উত্তর দিল, কেন বলুন তো? একটা মানুষের জীবন—সে-টা কি এতই অসার? তার কি এতটুকুও দাম নেই! তাছাড়া এ হল আমাদের ডিউটী…জানেন তো?

উত্তরার শীর্ণ গাল বহিয়া অজস্র অশ্রু নামিয়া আসিল, জানে সে সবই। কিন্তু তাহার জীবনের কতটুকু মূল্য! সে যে কায়-মনোবাক্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিল যে তাহাকে মৃত্যুর অমৃত পরশ দিয়া মুক্তি দাও। কে চাহিয়াছিল এই জীবন, তুচ্ছ! তুচ্ছ! যাহার দাম একটা কানা কড়িও নহে, রূপহীনা নারী…।

দিবাকর ব্যস্ত হইয়া উঠিল: ওই দেখুন, আবার আপনি কাঁদচেন। একে কতদিন পরে আপনার জ্ঞান ফিরে এসেছে, সমস্ত শরীর, ভীষণ দুর্ব্বল, এরপর কিছু হ'লে আর আপনাকে বাঁচাতে পারবো না। দোহাই আপনার, লক্ষীটীর মত একটু চুপ করুণ, কাঁদবেন না…আপনি একটু সেরে উঠলেই আমি আপনাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

উত্তরা কথা কহিল না, বাড়ী! কোথায় সে যাইবে, বাবা আছেন; সে বড় স্নেহময়, সে যে তাঁহার পথ চাহিয়া রহিয়াছেন, উত্তরা কি সেইখানে অবশেষে ফিরিয়া যাইবে!

নাঃ দুর্ব্বল মস্তিস্কে এত জটিল চিন্তা সহে না। কতক্ষণ পরে উত্তরা আবার মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার কি হয়েছিল?

দিবাকর একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আপনার মাথায় আর বুকে ভীষণ চোট লেগেছিল। সুখের বিষয় আপনি বেঁচে উঠেচেন, নইলে সাধারণতঃ এ অবস্থায় কেউ বাঁচে না। যাক্‌গে ওসব কথা, আজ একটু ভাল আছেন?

উত্তরা ক্ষীণগলায় কহিল, হ্যাঁ···কতদিন পরে আমার জ্ঞান হয়েছে, বললেন!

দিবাকর কহিল, প্রায় একুশদিন। কিন্তু ও কথা এখন না তোলাই ভাল। আপনি সুস্থ হ'য়ে উঠলে পরে এ সমস্ত আলোচনা করবার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। আপনি ফুল ভালবাসেন! আপনার টেবিলে কিছু ফুল পাঠিয়ে দেব? আমার বাগানে অনেক ফুল আছে কিন্তু।

উত্তরা মাথা নাড়িয়া কহিল, না, ওসব আমার ভালো লাগে না। ফুল· ফুল নিয়ে কি হবে···

বলিতে বলিতে উত্তরা আবার অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার এই জীবনে ফুলের যাহা প্রয়োজন, তাহাতো শেষ হইয়া গিয়াছে! সেই রাত্রে, ফুলশয্যার রাত্রি···থরে থরে ফুল বিছানো শয্যায় ফুলের গহনা পরিয়া উত্তরা দুরু দুরু কম্পিত বুকে বসিয়াছিল; গভীর রাত্রে নিশীথ আসিয়া সে শয্যা স্পর্শও করিল না। গলা হইতে মোটা বেলের মালাগাছি সজোরে টান দিয়া ছিঁড়িয়া একটা নরম গদী-আঁটা সোফার উপর অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিল উত্তরা তো তাহা ভুলিতে পারে নাই···! সে কথা নিঃসঙ্গ শয্যায় শুইয়া কত সহস্রবার স্মরণ করিয়াছে···চোখের উষ্ণ জলে বালিশ

ভজিয়া গিয়াছে, তবুও অনায়াস ভরে অবলীলাক্রমে নিশীথ তাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছে। ওর জীবনে একটী মুহূর্ত্তকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যে সেই মুহূর্ত্তটী নিশীথের ভালবাসার আভায় রঙীন হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তবুও উত্তরা নিশীথকে পুরাপুরি দোষ দিতে পারে না। আর যাহাই করুক, নিশীথ যে তাহার সহিত ভালবাসার অভিনয় করিয়া প্রবঞ্চনা করে নাই, এতটুকুই তাহার মহত্ব। সত্যকে সে মিথ্যা দিয়া আড়ম্বর করিয়া ঢাকিতে চাহে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে উত্তরার মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। এই ডাক্তারটী ভদ্রলোক তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উত্তরাকে ইনি এত যত্ন করিতেছেন কেন? ইহার বাড়ীতো দেখা যাইতেছে স্ত্রীলোক-বর্জ্জিত। উত্তরা কি এতদিন ইঁহারই আশ্রয়ে কাটাইয়াছে!

রোগশয্যায় শুইয়া উত্তরা আরও কয়েকটা দিন কাটাইল। দিবাকরের ব্যবহার অত্যন্ত মার্জ্জিত, ভদ্র। উত্তরার তাহাতে বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস নাই। উত্তরা যেদিন উঠিয়া বসিয়া পথ্য গ্রহণ করিল সেইদিন দিবাকর কহিল, এবার আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা বলুন দেখি···যাদের জিনিষ তাদের ফিরিয়ে দি-ই।

উত্তরার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, ভয়ে ভয়ে দুইটী চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল দিবাকর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে।

গলার স্বর নামাইয়া উত্তরা কহিল, এখান থেকে কাঞ্চনপুর কতদূর? দিবাকর মিষ্টি গলায় কহিল, তা অনেকটা দূর বই কি··· সেখানে কি আপনার শ্বশুর বাড়ী?

উত্তরা মাথা নাড়িল।

—তবে? বাপের বাড়ী বুঝি? আপনার কপালে যেন সিন্দুর দেখেছিলাম, স্বামী—? দিবাকর কহিল।

উত্তরা নতনয়নে কহিল, আছেন, কিন্তু সেখানে আমি খবর দিতে চাই না, আপনি দয়া করে আমার বাবাকে একখানা চিঠি দিন···তাঁর কাছে যাওয়া ছাড়া আমার আর উপায় নেই।

অশ্রুমুখী উত্তরা পুনরায় কহিল, বাবা যদি গ্রহণ করেণ তবেই তাঁদের জানাবো। জানেন তো হিন্দু সমাজের ব্যাপার! এতটা দিন আমি কোথায় কি ভাবে কাটালাম, সেই কৈফিয়ৎ দাখিল করতে করতেই আমার—তাছাড়া—

—বুঝেছি। দিবাকর শান্তকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা, আমি আপনার বাবাকেই আজ চিঠি লিখে দিচ্ছি, তাঁর নামটা জানাবেন। আর হাঁা, যদি কিছু মনে না করেন, তাহ'লে আপনার নামটাও— কারণ সব কথা তাঁকে খুলে লিখতে হবে তো!

উত্তরা ধীর গলায় কহিল, মনে করার কিছুই নেই এ-তে, আমার নাম উত্তরা দেবী। দিবাকর কহিল, কিচ্ছু ভাববেন না আজ চিঠি লিখলে তিনি কালই পেয়ে যাবেন। আজ সোমবার মঙ্গল বুধটা মাঝে থাক শুক্রবারের ভেতর আপনি ফিরে যেতে পারবেন। আমি একটা টনিক লিখে দেব'খন, সেখানে খাবেন।

আচ্ছা, আমি আজ একটু এখন বাইরে যাব, মানে রোগী দেখতে যা কাজ আমার, বলেন কেন! সাধনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি··· আপনার যদি বই-টই পড়তে ইচ্ছে করে, তাহ'লে ওকে বলবেন ও এনে দেবে। তবে আর কিছুদিন পরেই বাড়ীর মেয়েরা এসে পড়বেন, তখন আপনার এই নিঃসঙ্গ-জীবন—ইস, দেখুন তো কি আমার ভোলা মন, আপনি তো দু'তিন দিনের মধ্যেই বাড়ী চলেছেন।

দিবাকর হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রাণ খোলা হাসি। চমৎকার অমায়িক ভদ্রলোক—সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি।···

বুড়া চাকরটা আসিয়া উচ্ছিষ্ট পাত্র উঠাইয়া লইয়া গেল দিবাকর বাহিরে যাইবার আগে একবার উঁকি দিয়া মিষ্টি গলায় কহিল, সাধনকে বই আনতে বলে দিইছি···আপনার কিছুক্ষণ একা থাকতে ভয় করবে কি ?

ভয়! উত্তরার ওষ্ঠাধর ক্ষীণ হাস্যে রঞ্জিত হইল! কীসের ভয় তাহার, এতটা দিন যখন তাহারই আশ্রয়ে কাটাইল, নিঃসম্পর্কীয়, অনাত্মীয় যুবকের নারী বর্জ্জিত গৃহে, তখন আজ কয়েক ঘণ্টার জন্য উত্তরার ভয় করিবার কী-ই-বা কারণ আছে। সাধন, কম্পাউণ্ডার সুন্দর ছেলে, উত্তরাকে সত্যই দিদি জ্ঞানে ভক্তি করে, আর ওই বুড়া চাকর রামদিনটা···উহাদের ভয়! নাঃ উত্তরা অতটা পানসে মেয়ে নয়।

মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া উত্তরা কহিল, কিচ্ছু ভয় করবে না, আপনি আসুন, আমার জন্য অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়েছে।

দিবাকর মুখ ফিরাইয়া কহিল, কি বললেন. ক্ষতিগ্রস্থ! একটি জীবনকে যে আমি যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি আমার কতবড় সৌভাগ্য, তা জানেন!

দিবাকর কথা কয়টী বলিয়া ভারী জুতার শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আট

রৌদ্র-অলস দ্বিপ্রহরে শোনা যাইতেছে একটা ডাহুকের অশ্রান্ত কণ্ঠস্বর, কোথায় কোন বনে বা ঝোপের আড়ালে লুকাইত ঘুঘুর সকরুণ চীৎকারের সহিত পাল্লা দিয়া ডাকিতেছে। অদূরে একটা নদীর কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, মেঘের রংয়ের সহিত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তার জলের রঙ্ও বদলাইতেছে, কখনো গাঢ় নীল, কখনো রাঙা, বা ধূসর, কখনো বা রূপালী পাতের মত ঝক্‌মক্ করিতেছে।

জানালার ধারে ইজি চেয়ারে শুইয়া উত্তরা তাহাই দেখিতেছিল। আজ লইয়া তিন দিন গত হইয়া গিয়াছে, দিবাকর তাহার

পিতাকে সংবাদ দিয়াছিল কিন্তু আজিও কোন উত্তর আসিয়া পৌঁছাইল না কেন? উত্তরার পিতা তো স্নেহ-মমতা শূন্য নিষ্ঠুর নন্…কন্যা যে এত বড় ট্রেন দুর্ঘটনা সত্বেও বাঁচিয়া রহিয়াছে, এবং সাগ্রহে তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, ইহা শুনিয়াও কি তাঁহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠে নাই! মাতৃহারা অভাগিনী মেয়েটীর প্রতি তাহার করুণার সিন্ধু কি এত শীঘ্রই শুকাইয়া গিয়াছে; উত্তরা ভাবিয়া পায় না কেন এরূপ অঘটন ঘটিয়াছে…

তবে কি তাহার অনুমানই সত্য! উত্তরার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল,—বাবা বাবাগো…উত্তরাকে কি তুমিও অবশেষে ভুল বুঝিয়াছ? জন্মিয়া যে মাতৃমুখ দর্শন করে নাই, মা'র অপর্য্যাপ্ত স্নেহের স্বাদ যে কেমন সে তাহা জানে না, তাহাকে পৃথিবীর আলোক দর্শন করাইয়াই মা তাঁহার জন্মের শোধ চক্ষু মুদেন। উত্তরার কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতিই হয় নাই, পিতা তাহাকে স্নেহ-পক্ষপুটের অন্তরালে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই স্নেহময় পিতা আজ তাহাকে বিস্মৃত হইলেন কি বলিয়া!

সে তবে কাহার আশ্রয়ে যায়…কাহার বক্ষে মাথা রাখিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া বুকের অফুরন্ত ব্যথা লাঘব করে!

স্বামী তাহার, অথচ তাহার নয়, শুধু মাত্র কয়েকটা মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন! সেই মন্ত্র কয়টা কি শুধু নামমাত্র শুষ্ক মন্ত্র, অক্ষরের সমষ্টি! সেই যে বিবাহ সভায়

হাতে হাত রাখিয়া বলিয়াছিলেন 'তোমার আমার জীবন চির-জীবনের জন্য অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা হউক···আজ হইতে তুমি আমার গৃহের ও জীবনের সাম্রাজ্ঞী হইলে।'

সেই পবিত্র বেদমন্ত্রের কতটুকু সম্মান নিশীথ রাখিয়াছে, নিষ্প্রাণ পুতুলের মত তাহাকে সাজাইয়া গোছাইয়া লইয়া গিয়া অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দিয়াছে।

একমাত্র আশ্রয় শ্বশুর, কিন্তু সেখানেও তাহার স্থান হয়তো নাই। হিন্দু সমাজ এখনও এতটা উদার হইয়া উঠে নাই যে এক সম্পূর্ণ অনাত্মীয় যুবকের বাসাবাড়ীতে যে মেয়েটী দীর্ঘ দিবস কাটাইয়া আসিয়াছে, সে যত নিষ্পাপই হউক না কেন, নিরাপত্তিতে তাহাকে গ্রহণ করিবার মত উদারতা দেখাইবে। লজ্জায় ক্ষোভে উত্তরার দগ্ধ মন গভীর ক্ষতের মত রহিয়া রহিয়া জ্বলিতে লাগিল।

দুইদিন পূর্ব্বে পিতার স্নেহকোমল বুকটীতে ফিরিয়া যাইবার কল্পনায় সে যে স্বর্গ রচনা করিয়াছিল, সে স্বর্গ মুহূর্ত্তে যেন ক্লেদাক্ত ধূলার ধরণীতে নামিয়া আসিল।

একটী পুরুষের যাহা খুসী করিতে পারে, যেথা ইচ্ছা থাকিতে পারে, একদিন নহে মাসের পর মাস, দীর্ঘ দিবস, কিন্তু একটী অসহায়া নারীর বেলায়—বিশ্বাস—নৈব নৈব চ। মেয়েদের বেলাতেই যত সন্দেহ আর যত রাজ্যের গ্লানি।···মেয়েরা যেন পাপ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে! মেয়েরা যেন প্রতিপদে অস্থির প্রতিপদে চঞ্চল।

উত্তরার অদৃষ্ট

গৃহদ্বার লম্বিত ভারী পর্দ্দাটা সরাইয়া সাধন ঘরে ঢুকিল, তাহার হাতে তিনচারখানি মোটা মোটা বহি···। কুণ্ঠার সহিত বহিগুলি উত্তরার সুমুখের টিপয়ে রাখিয়া সাধন কহিল, বইগুলো আপনি পড়বেন দিদি ?

উত্তরা চট করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া কহিল, কি বই এনেছ সাধন ?

সাধন কহিল, এগুলো হচ্ছে আপনার ডিটেক্‌টিভ, এখানা পাঁচকড়ি বাবুর নীলবসনা সুন্দরী, এখানা হত্যাকারী কে, আর—

উত্তরা হাসিয়া স্নিগ্ধস্বরে বাধা দিয়া কহিল, থাক ওসব সাধন, ডাক্তারবাবু কি এইগুলো পড়েন ? তাঁর আলমারীতে যদি কোনও ইংরেজী বই থাকেতো নিয়ে এস, যা পাও।

সাধন বিস্ফারিত চোখে কহিল, আপনি পড়বেন ? আছে অনেক ভালো ভালো বই···আর এগুলো মা যখন থাকেন্ তখন পড়েন। মা আবার ডিটেক্‌টিভ বই পড়তে বড্ড ভালবাসেন কি-না ?

উত্তরা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, মা'-কে সাধন ? বাবুর মা ?

—আজ্ঞে না। বাবুর স্ত্রী ! এদিকে ভালমানুষ কিন্তু রাগলে আর রক্ষে নেই, আর একটা মস্ত দোষ আছে তাঁর দিদি, ভীষণ, ভীষণ শুচিবাই···তিনি এলে দেখবেন বাবু আর ঘরেই ঢুকবেন না। মা বলেন, যা-তা কাপড় পরে এস, ও সব আগে গঙ্গা-জলে কাচ, তবে চান করে ঘরে ঢুকো। ও সব ম্লেচ্ছপনা।

বাবুর তখন বড় কষ্ট হয় দিদি···কি করবেন, দামী [illegible]নাকে তো আর গঙ্গাজলে কেচে নষ্ট করতে পারেন না।

উত্তরা কথাগুলি অবাক হইয়া শুনিতেছিল। দিবাকরের স্ত্রী। এখানেও সেই দাম্পত্য-জীবনের অশান্তিময় কাহিনী। দিবাকরের মত স্বামীকে যে এতখানি হয়রাণ করিবার ক্ষমতা রাখে, না জানি সেই মেয়েটাই বা কিরূপ প্রকৃতির। কিন্তু দিবাকরের মুখ দেখিলে বোঝা যায় না যে তাহার গৃহে শান্তি নাই! ঠোঁটের উপর স্নিগ্ধ হাসিটী যেন সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে, মন যেন যুথিকার মত নিষ্পাপ, নির্ম্মল।

উত্তরা কহিল, তিনি কবে আসবেন সাধন?

সাধন টেবিলের উপর একখানি হাত রাখিয়া মলিন গলায় কহিল, শীগ্‌গীরই, শুনচি তো আসচে হপ্তায়। আপনার বাপের বাড়ী থেকে যে চিঠি এসেছিল, তা পেয়েছেন দিদি?

চিঠি!

উত্তরার বক্ষের রক্ত দ্রুততালে নাচিয়া উঠিল। বাঁহাতে বুকটা চাপিয়া সে কোনরকমে বলিল, কই, কই সে চিঠি সাধন? কখন এসেছে? কই আমাকে তো ডাক্তার বাবু কিছু বলেন নি।

সাধন কহিল, হয়তো তাঁর মনে নেই, ডাক্তার বাবুর নামেই এসেছে কিনা! ওঁর টেবিলেই সেটা পড়ে রয়েছে।···

—এনে দাও সাধন, লক্ষ্মীটী···তুমি জানো না, আজ কদিন ধরে আমি কি-রকম ছটফট কর্চ্ছি।···

সাধন কহিল, আচ্ছা এনে দিচ্ছি।…কিন্তু উনি রাগ ক'রবেন না তো?

উত্তরা মুহূর্ত্তমাত্র ভাবিয়া কহিল, রাগ, না তিনি বোধহয় রাগ করবেন না, রাগ ক'রবার মানুষ নন, অন্ততঃ এটুকু বুঝেছি।

সাধন চলিয়া গেল, উত্তরা কম্পিতপদে আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পদদ্বয়ে তখনও সম্পূর্ণ শক্তি ফিরিয়া আসে নাই, টলিতেছে। দেওয়াল ধরিয়া উত্তরা আর একটু অগ্রসর হইয়া দ্বারের দিকে সরিয়া গেল। বিলম্ব আর সহে না। নিশ্চয়ই পত্রে তাহার পিতা লিখিয়াছেন 'ওরে আয়, ফিরিয়া আয় মা, আর কেহ তোকে আশ্রয় না দিক, আমার বুভুক্ষু অন্তর তোকে সর্ব্বান্তঃকরণে চাহিতেছে।'

টস্ টস্ করিয়া উত্তরার গাল বহিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, দেওয়ালটী দুই হাতে ধরিয়া উত্তরা অধীরভাবে সাধনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মিনিটগুলি কাটিতেছে তাহাও উত্তরার কাছে অসহ্য।

সাধন আসিয়া পত্রখানি উত্তরার হাতে দিয়াই কহিল, আপনি এতখানিটা হেঁটে এসেছেন দিদি? পড়ে যাবেন যে, একেতো মাথার ব্যাণ্ডেজটা আজও খোলা হয়নি।

উত্তরা হাসিয়া কহিল, না হোক…কিন্তু হাতের লেখাটা তো বাবার বলে মনে হচ্ছে না! কে লিখলে এই চিঠি!

উত্তরা কম্পিতহাতে খামের আবরণ হইতে পত্রখানি [illegible]চন করিয়া চোখের সুমুখে মেলিয়া ধরিল।

এ কী! উত্তরার হাত দুইটা এত কাঁপিতেছে কেন? সাধন ব্যাকুল গলায় ডাকিল, দিদি, ও দিদি, বসে তারপর চিঠি পড়বেন চলুন।

কিন্তু উত্তরা তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্যা! হাতের কাগজের উপর অগ্নিময় কয়েকটা অক্ষর নৃত্য করিয়া চলিয়াছে।

মহাশয়ঃ আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। বিগত ট্রেণ দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াই উত্তরার বাবা অকস্মাৎ হার্টফেল করেন। আমি তাঁহার নিকট-আত্মীয়। সম্পর্কে তিনি আমার ছোট ভাই ছিলেন। তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া সমস্তই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পন্ন করিয়াছে। আর উত্তরাকে গ্রহণ করিবার সম্বন্ধে আমার ম[illegible] —যেহেতু সে এতদিন কোথায় কিভাবে অর্থাৎ সৎ কিম্বা অসৎ ভাবে কালযাপন করিয়াছে সে খবর জানি না, সেহেতু মাত্র আপনার মুখের কথায় এতবড় অধর্ম্মের কাজ করিতে পারি না। ছাপোষা মানুষ, আমারও মহাশয় দুই তিনটি অবিবাহিতা কন্যা রহিয়াছে—যে মেয়ে এতটা দিন পরাশ্রয়ে কাটাইতে পারে—তাহার আবার আশ্রয়ের ভাবনা!···

মাগো!

উত্তরা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া দেওয়ালে মাথা হেলাইয়া চক্ষু মুদিল। এই তীক্ষ্ণ শর তাহার কোমল বক্ষে ছুটিয়া গিয়া বিঁধিয়াছে। পিতা নাই, তাহার একমাত্র শেষ আশ্রয় চিরতরে

কালের কোলে বিশ্রাম লভিয়াছে, তবে আর এতবড় বিশ্বে তাহার মত অসহায়ার স্থান কোথায় ?

উত্তরার মুখ দেখিতে দেখিতে কাগজের মত শুভ্র হইয়া উঠিল। দুইটী চক্ষু নিমীলিত, সাধন ব্যস্ত হইয়া উত্তরার মাথাটা দুই হাতে ধরিয়া ব্যাকুলস্বরে ডাকিল, দিদি, ও দিদি, শুনচেন ? শরীর কি বড্ড খারাপ লাগছে ?

উত্তরা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল। শান্তি তাহার অদৃষ্টে নাই, নহিলে স্বামী তাহার বিমুখ হইত না, পিতা অকালে দেহত্যাগ করিতেন না। উত্তরার সুমুখে এইবার অফুরন্ত, দীর্ঘ পথ, দীর্ঘ জীবন, সে কি করিবে।

সাধনের প্রশ্নে সে ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, ডাক্তারবাবু ফিরবেন কখন জানো, সাধন ?

সাধন কহিল, জানি, বিকেল নাগাদ। দিদি, চিঠিতে কি কোন দুঃসংবাদ ছিল ?

উত্তরা বহুকষ্টে উত্তর দিল, হ্যাঁ ভাই, আমার বাবা, সাধন, বাবা আর আমার নেই। উত্তরার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। সাধন অপ্রতিভ হইয়া নীরবে হাতের আঙ্গুলগুলি মটকাইতে মটকাইতে কুণ্ঠাপূর্ণ স্বরে কহিল, ডাক্তারবাবু শুনলে হয়তো আমার ওপর রাগ করবেন, দিদি।

নয়

উত্তরা মৃদু গলায় কহিল, ভয় নেই সাধন, আমি তোমার দোষ দেব না, বলবো আমি নিজেই টেবিল থেকে নিয়েছি ওই চিঠি।

বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া দিবাকর পোষাক ছাড়িয়া বাহিরের ঘেরা বারান্দায় আসিয়া দেখিল উত্তরা তাহার চায়ের টেবিলের সম্মুখে নিশ্চল একখানি প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রোগপাণ্ডুর মুখের উপর অস্তসূর্য্যের ম্লান আলো খানিকটা চলকাইয়া পড়িয়াছে। কপাল হইতে কানের পাশ বেড়িয়া ব্যাণ্ডেজটী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার দরুণ উত্তরার শীর্ণ মুখখানি আরও করুণ দেখাইতেছিল।

উত্তরার দৃষ্টি ছিল আকাশের দিকে! ওই আকাশের কোলে মেঘের রাজ্যে যাহারা যায় তাহাদের কি করিয়া পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায়? আগে ওই আকাশ উত্তরার এত প্রিয় ছিল না। আজকাল ওই আকাশ তাহার এত মিষ্ট লাগে, দেখিতে দেখিতে চোখ জলে ভরিয়া আসে, মন মায়াতুর হইয়া যায়।

দিবাকর কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া কহিল, একি দুর্ব্বল শরীর, আপনি বাইরে এসেছেন উত্তরাদেবী ?

উত্তরা চম্‌কাইয়া উঠিল। শিথিল অবগুণ্ঠনটুকু সিঁথির উপর তুলিয়া দিয়া আর্দ্র-গলায় কহিল, ডাক্তারবাবু !···

দিবাকর বিস্মিত গলায় কহিল, কি বলচেন ? কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ?

উত্তরা মুখটা নীচু করিয়া উত্তর দিল, এবার আমি যেতে চাই ডাক্তারবাবু।···

—যেতে চান ? কোথায় ?

দিবাকর আশ্চর্য্যভরে জিজ্ঞাসা করিল।

উত্তরা কহিল, আমি আমার জেঠাম'শায়ের চিঠি পড়েছি, সবইতো জেনেচি, এ আমার অদৃষ্ট। আপনি আমার জন্যে অনেক কিছুই করেছেন—এবার···

দিবাকর স্নিগ্ধস্বরে কহিল, এবার কি তবে শশুরবাড়ী যাবেন ঠিক করেছেন ?

উত্তরা স্থির ভাবেই উত্তর দিল, না। সেখানে আর ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই, সেখানে শশুর আমার আরও গোঁড়া। তিনি আমাকে ক্ষমা করলেও আমাকে গ্রহণ করে তাঁর বংশমর্য্যাদা ক্ষুন্ন করবেন না। ডাক্তারবাবু, নিজে কোন দোষ করিনি, এ অবস্থায় পাচজনের কাছে যোড় হাত করে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না···। আমার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটুক।

দিবাকর চিন্তিত গলায় কহিল, তাইতো আপনি ভাবিয়ে

তুললেন দেখচি···কিন্তু আপনার স্বামীর কাছেও কি ফিরে যেতে চান না? তিনি হয়তো—

—না ডাক্তারবাবু, সেখানেও আমার স্থান নেই, তার কাছে আমি একটা বিড়ম্বনা মাত্র! অদৃষ্ট যখন আমায় এমনি করে পথের মাঝে টেনে ফেলেচে—তখন দেখবো সে আমাকে কোথায় নিয়ে যায়! এত কাজ আছে, আমি কি সামান্য একটা কাজও খুঁজে নিতে পারবো না?

দিবাকর কহিল, তা অবিশ্যি পাবেন। একটা কথা, উত্তরা-দেবী; যে কদিন না কোনও কাজ খুঁজে পান, এবং যতদিন না আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ না হ'য়ে ওঠেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপনি নির্ভয়ে এখানে থাকুন। এখানে আমাদের দিক থেকে আপনার এতটুকুও সম্মানের হানি হবে না। ছোট বোন যেমন বড় ভাইয়ের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে থাকে, ঠিক সেই রকম মনটি নিয়ে আপনি এখানে থাকুন···। দেখুন, আমারও একটী বোন ছিল, তাঁকে খুব বেশী দিন নয় হারিয়ে বুকের একটা দিক আমার খালি হ'য়ে গেছে। তাকে আমি বড় ভালবাসতুম। জীবনে আমি এতটা ভাল কাউকে বাসিনি। না, আমার একটা রোগ আছে, বড্ড বেশী কথা কই···ওই জন্যে, একি উত্তরাদেবী, আপনি কাঁদচেন? কই আমি তো কাঁদবার মত কোন কথা বলিনি···!

দিবাকর ব্যস্ত হইয়া উঠিল। উত্তরা আঁচলের প্রান্তে মুখ চোখ মুছিয়া ভগ্ন স্বরে কহিল, বাবাকে হারিয়ে বড্ড আমার লেগে-ছিল, ভেবেছিলুম আমার মুখ চাইতে বুঝি কেউ নেই—কিন্তু

আজ আপনার কথাগুলো শুনে আমার বাবাকেই বড্ড বেশী করে মনে পড়েছে…!

উত্তরার চোখের জল আর বাধা মানিল না। তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে আশঙ্কায় পিতা তাহার প্রাণ দিয়াছেন, কন্যার বিরহ তিনি বুঝি সহিতে পারিবেন না, ইহাই ভাবিয়াছিলেন। কতখানি আঘাত তাঁহার বক্ষে শেলসম বাজিয়াছিল, তাইতো মহাসমারোহে মৃত্যুর আবির্ভাব।…আকস্মিক আবির্ভাব। যে পিতা উত্তরাকে শশুরালয়ে পাঠাইবার সময় গোপনে তাহাকে বুকে টানিয়া শিশুর মত উচ্ছ্বসিত ভাবে রোদন করিয়াছিলেন, সেই পিতার আর চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই, উত্তরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা ভাঙ্গিলেও তাঁহার নিকট হইতে সাড়া আসিবে না। মাথা কুটিয়া মরিলেও তিনি আর শরীরী মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন না।

তাঁহার সেই সুপরিচিত সহাস্য আনন যেন উত্তরার চক্ষুর সুমুখে ভাসিতেছে।

কয়েক দিনের পরেই দিবাকরের ছোট্ট বাড়ীখানি ছেলে-মেয়েদের চীৎকারে ও নানাবিধ কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিল। দিবাকরের স্ত্রী গরুর-গাড়ী হইতে একখানি পাটের সাড়ী পরিয়া নামিয়া আসিলেন। সম্পূর্ণ খোলা দেহ, জামা সেমিজের বালাই নাই, তাহার উপর শুচিতা বাঁচাইবার জন্য হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড়

তুলিয়াছেন। লম্বাটে দেহ, এত শীর্ণ যেন কোন শক্ত অসুখ হইতে সদ্য উঠিয়া আসিয়াছেন।

তিনি বাড়ীতে পা দিয়াই আকাশ বিদারণ স্বরে কহিলেন, সাধন...রামদীন।...সাধন একটা ঔষধের খালি শিশি হাতে করিয়াই ছুটিয়া আসিল। গৃহিণী সপ্তমে গলা চড়াইয়া কহিলেন, বাড়ীতো দেখছি বাসের যুগ্যি করে রাখোনি...বলি গঙ্গাজল টল রেখেচো আনিয়ে—না তোমার বাবুর সে খেয়ালও নেই? নাঃ জাতজন্ম আর রইল না কিছু...

সাধন ত্রস্ত গলায় কহিল, গঙ্গাজল একটা পিতলের কলসী করে আনিয়ে রেখেছি মা, ওই ওই ভাঁড়ার ঘরে আছে।

সাধন আবার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল। তাহার পর চলিল, সমস্ত বাড়ীখানি সিলীং হইতে চৌকাঠ পর্য্যন্ত ধোয়া-মোছা।... রামদীন বেচারী ঝাঁটা লইয়া হাঁফাইতে লাগিল!

গৃহ-দ্বার সংস্কার হইলে গৃহিণীর চোখ পড়িল উত্তরার দিকে। উত্তরা তাহার ঘরের বারান্দার এক পার্শ্বে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া ছিল।

গৃহিণী থমকিয়া উত্তরার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, ও, তুমিই বুঝি সেই মেয়েটা? অল্প বয়স! তোমার কাপড়-চোপড় কাচা তো?

উত্তরা এই ধরণের প্রশ্ন শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গেল। দিবাকরের স্ত্রী তাহার চাইতে কতই বা বড়...হয়তো তিন চার বছরের হইতে পারে। কিন্তু তাহার গৃহিণীদের মত পাকা-পাকা ভারিক্কে

চানের কথাগুলি উত্তরার বিশেষ ভাল লাগিল না। দিবাকরের এই স্ত্রী…! কুরূপা, কুৎসিতা শুচিবায়গ্রস্তা এক নারী। দিবাকরের জীবন যে ইহাতে অসহ্য হইয়া উঠে নাই কেন, ভাবিবার বিষয় বটে। অদ্ভুত সহ্য-শক্তি দিবাকরের। তবু এই স্ত্রীর আদেশও সে অম্লানমুখে মাথা পাতিয়া লইতেছে।

উত্তরা মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল তাহার পরিধানের জামা-সেমিজ মায় সাড়ী সমস্তই শুদ্ধ।…উত্তরার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া গৃহিণী কহিলেন, তোমরা কি কায়েথ ?—

উত্তরা মৃদুস্বরে কহিল, না, ব্রাহ্মণ।

ওঃ বামুন…তা বলতে হয়…! তা, এখন আবার তোমাকে ছুঁয়ে তো পেন্নামও করা যাবে না,আহ্নিক পূজো কিছু হয়নি কি-না…! তোমার বুঝি মন্তর নেওয়া হয় নি ?

উত্তরা কহিল, না।

—নেওয়া ভাল। বামুনের মেয়ে, একটু আচার-বিচের না হলে—ও-মা মণ্টু তুই কোত্থেকে একগা ধূলো মেখে এলি—সর বাপু, এক্ষুনি ছুঁয়ে ফেলবি, তোর আবার গাড়ীর কাপড়।

গৃহিণী তিন হাত লাফাইয়া সরিয়া গেলেন। দিবাকরের ছোট ছেলে মণ্টু উত্তরার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আধো গলায় কহিল, মাছিমা।…

উত্তরা সস্নেহে তাহাকে নিকটে টানিয়া লইল। তাহার ভ্রমরের মত কালো চুলের উপর অধর স্পর্শ করিয়া কহিল, কে তোমাকে বল্লে মাণিক ?

—বাবা…। ওই যে বাবা…যাই আমি বাবা কাছে…

মণ্টু উত্তরার হাত ছাড়াইয়া তর তর করিয়া নামিয়া গেল।
উত্তরা ঈষৎ অপ্রতিভ গলায় প্রশ্ন করিল, আপনার বুঝি এখনও পূজো সারা হয়নি?

—না।

ঈষৎ অপ্রসন্ন মুখে গৃহিণী ওই কথা কয়টি বলিয়াই গম্ভীরভাবে নামিয়া গেলেন।

আকাশ তখন উজ্জ্বল নীল দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিয়াছে! উত্তরা সেইদিকে চাহিয়া রেলিংটা চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—না, তবুও তোমার কাছে উত্তরা ফিরিয়া যাইবে না…তুমি তুমি সুখী হও…। উত্তরা তোমাকে যে ভালবাসিতে পারিয়াছে ইহাতেই সে পরম সন্তুষ্ট…। এই যে তাহার চারিদিকে অপরিসীম অন্ধশূন্যতা তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে…ইহাও তাহার ভালো—ভালবাসার কাছে আরকি কিছু স্বার্থ থাকে প্রিয়তম? উত্তরা নাই বা তোমার পাশে রহিল, তাহার সমস্ত মনখানি দিবা-রাত্রি ঈশ্বরের কাছে তোমারই কল্যাণ কামনায় মগ্ন রহিয়াছে। সত্যকারের রাজপুত্র যখন হৃদয়-সিংহাসনে স্থান পায়, তখন কল্পনায় পড়া রাজার দুলাল প্রভাতের রাঙা আলোয় চাঁদের মতই মিলাইয়া যায়। বাহিরে আর তাহার তো কোনও ক্ষোভ নাই, এ জীবনে উত্তরার যাহা পাওয়ার নেশা ছিল—তাহার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, এখন পূজারিণীর সমস্ত ভালোবাসা মিশিয়াছে পূজার সমুদ্রে।…

তবে এখানের আশ্রয়ের ভিতও যে কাঁচা, সে কথা আজ উত্তরা বুঝিতে পারিল দিবাকরের স্ত্রীকে দেখিয়া; কারণ দিবাকর তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিলেও অত্যন্ত ভদ্র, যাহাকে বলে নির্বি-রোধী, নিরীহ। সোজা কথায় ঝগড়ার পক্ষপাতী নন। দিবাকর তাহার স্ত্রীকে ভয় করে না, ভয় করে তার ক্ষুরধার রসনাকে···।

দশ

সংবাদপত্রে এখন বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইল "ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা" চারিখানি বগি চূর্ণ-বিচূর্ণ ও হতাহতের সংখ্যা...ইত্যাদি। তখন সারা সহরটায় চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। হত ও আহতদের তালিকায় আপন আপন আত্মীয় স্বজনের নাম আছে কি না, প্রত্যেকে তাহাই উৎকণ্ঠিত ভাবে দেখিতে লাগিল।

নিশীথও সেই কাগজখানি পড়িল, চায়ের পেয়ালা পড়িয়াই রহিল তাহার! একান্ত মনোযোগের সহিত দেখিতে-দেখিতে আহতদের সংখ্যায় বিন্দিদাসীর নাম দেখিয়া অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ

করিয়া উঠিল।…বিন্দি আহত…সরকার মহাশয়ের নামও এইতো আহতদের সংখ্যায় রহিয়াছে, এই তো শ্রীপরেশচন্দ্র সরকার। কিন্তু আর একজন…সেই চির অনাদৃতা উত্তরা…তাহার নাম নাই কেন, তবে কি সে হত…মরিয়া গিয়াছে…সুন্দর মুখখানা ছেঁচিয়া বিকৃতি লাভ করিয়াছে…! অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়তো কোনটা ছিল, কোন অংশটা বা কাটিয়া গিয়াছে…! তাই তাহার নাম দেয় নাই। কে বা কাহার স্ত্রী, কি নাম, তাহারা কি করিয়া জানিবে… এক সঙ্গে হয়তো দড়ি বাঁধিয়া—

নিশীথ কাঁপিতে কাঁপিতে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, মা—?

পুত্রের আতঙ্ক বিহ্বল কণ্ঠস্বরে মাতা উদ্বেগ ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন,—কি হয়েছে বাবা নিশীথ, অমন কচ্ছিস কেন! তোর হাতে কি খবরের কাগজ? কী হয়েছে বল বাবা …আমার যে বড্ড ভাবনা হচ্ছে রে!

মাতা নিশীথের পিঠের ওপর সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিশীথ অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিল, তোমার বউ ট্রেণ কলিসানে মরে গেছে মা, হ্যাঁ সে মরেই গেছে মা…নইলে তার নাম বেরোয়নি কেন? আমি যাই—

গৃহিণী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, বউমা মারা গেছেন! এ তুই কী বলছিস বাবা? দেখ ভালো করে…ওরে বুকের ভেতর আমার যে কি রকম কর্চ্ছে…

নিশীথ রেলিং-এর উপর মাথা রাখিয়া রুদ্ধ গলায় কহির,'—' পুরের কাছাকাছি ট্রেণ কলিসান হয়, ওরা সেই গাড়ীতেই ছিল,

বিন্দি আর সরকার মশাইএর নাম আহতদের সংখ্যায় রয়েছে—এই দেখ প'ড়ে—

নিশীথ কাগজখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার বুকের ভিতর যে অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল, মা তাহা পুত্রের মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন। চক্ষু বহিয়া সত্য সত্যই তাঁহার অনর্গল অশ্রু নামিয়া আসিল। কৃত্রিমতার লেশমাত্রও নাই—আজ মনে হইল তাঁহার বধূকে তাঁহারা কত কটূক্তিই না করিয়াছেন। সে বেচারী কিন্তু কোন দিন মুখ ফুটিয়া কোনও অভিযোগ করে নাই, বা ক্ষুব্ধ হয় নাই।

নিশীথকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া গৃহিণী অশ্রুপ্লাবিত চোখে শুধু তাহার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, বাছারে···একটী দিনের জন্যে সে সুখী হয় নি ! বাবা নিশীথ, এ যে আজ আমার বুকে সইছে না।

নিশীথ কিছুক্ষণ মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া স্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকিয়া কহিল,—মা, আমি ঘরে যাচ্ছি একটু আমাকে একা থাকতে দিও—বাবাকে যা জানাবার তুমিই জানিও···

বলিতে বলিতে নিশীথ টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

যে মেয়েটীকে লইয়া তাহার দুশ্চিন্তা ও বিরক্তির অন্ত ছিল না, সেই মেয়েটী আজ তাহাকে সর্ব্ব-রকমে নিষ্কৃতি দিয়াছে। মুক্তি সে তাহাকে একদিন দিতে গিয়াছিল, আজ উত্তরাই মরিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়া গেল।

সে কি এই মুক্তিই মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছিল ?

সারাটা দুপুর সে দুয়ারে খিল দিয়া পড়িয়া রহিল। খাইবার নিমিত্ত বার বার ডাকিয়া মা ফিরিয়া গেলেন। বাড়ীময় এই দুঃসংবাদটুকু ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। উত্তরার জন্য আজ সকলেই দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে, সকলের মুখেই "আহা বাছারে" শোনা যাইতেছে। মিলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে···কর্ত্তারও আজ সাড়া শব্দ নাই—একমাত্র উত্তরার মৃত্যু সংবাদে এত বড় বাড়ীটা অকস্মাৎ যেন মৃতের মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এমনিই হয়···বাঁচিয়া থাকিতে যাহার দুর্দ্দশার সীমা ছিল না, আজ তাহার মৃত্যু সংবাদে বাড়ীময় হা-হুতাশের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে।

উত্তরা যদি স্বচক্ষে ইহা দেখিতে পাইত !

বিকালের দিকে নিশীথ যখন শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল, তখন চোখের জলে তাহার বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে। কাহার জন্য তাহার এই হৃদয়বেগ. কাহার বিরহে তাহার চোখের অশ্রু বাধা মানে নাই, যাহাকে একটি দিবসের তরেও সুখী করে নাই, তাহারই জন্য কেমন যেন একটা সকরুণ মোহে সমস্ত চেতনা "আবিষ্ট হইয়া আসিতেছে! কেন তাহার জন্য সমস্ত প্রাণ আকুল স্বরে কাঁদিয়া মরিতেছে···উত্তরা তাহার এ কি করিয়া গেল !

উত্তরা, উত্তরা···নিশীথ দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া রহিল। উত্তরার স্ত্রীহস্তের নিপুণভাবে গোছানো টেবিলটী এখনও যেন ঝক্ ঝক্ করিতেছে···বইএর সেলফ্ হইতে দেওয়ালের

ফটোগুলি পর্য্যন্ত ধূলিবিহীণ···আয়নার বুক পরিষ্কার নির্ম্মল··· এতটুকু অস্বচ্ছতা নেই···ইহাও উত্তরাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে···। নিশীথ উত্তরাকে সত্যই বড় বেদনা দিয়াছে···। সেই দুঃখে ও ক্ষোভেই তো উত্তরা এমন করিয়া বিদায় লইল।

কত ছোট ছোট কথা মনেই আসিতেছে। উত্তরার পিতা নিশীথের হাতের উপর উত্তরার হাতখানি তুলিয়া দিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিয়াছিলেন, "আমার আনন্দ-প্রতিমাকে চির জীবনের মত তোমার হাতে তুলে দিলুম।' তোমাদের জীবন আকাশের মত স্বচ্ছ হ'ক, ত্যাগে আর প্রেমে তোমরা পরস্পরের জীবনকে মধুময় সমুজ্জ্বল ক'রে তুলো।' উত্তরা মা আমার জীবনে কোনোদিন দুঃখ পায়নি, তুমি তাকে সুখী করো, বাবা···"।

নিশীথের মনের ভিতর যেন হাজার হাজার হাতুড়ী পিটিতেছিল।···বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা···! উত্তরা···তুমি বলিয়াছিলে একদিনঃ আমাকে আর দূরে দূরে রাখিও না···।" তোমার কথা রাখি নাই বলিয়া তুমি নিজেই দূরে, বহু দূরে চলিয়া গেলে···। বন্ধুত্বটুকু চাহিয়াছিলে, আমি তাহাও প্রাণ খুলিয়া দিতে পারিনি, এত সঙ্কীর্ণ মন আমার···। নিজের সুখই চাহিয়াছিলাম, তোমার দিকে ফিরিয়া চাহি নাই।···

সেই অন্ধকার কক্ষে নিশীথ আবার শান্তভাবে শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল।···কেমন যেন তাহার মনে হইতেছিল, উত্তরা মরে নাই, এই কক্ষের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে···!

তাহার মৃদু উপস্থিতিও যেন সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

... ...

দেশে আর নিশীথ থাকিতে পারিল না ; মাকে বলিয়া একদিন কলিকাতায় চলিয়া গেল। সেখানেও তার স্বস্তি নাই...চলিতে ফিরিতে উত্তরার বিষণ্ণ মুখের অপরূপ সেই হাসিটুকু তাহার চোখের পাতায় ভাসিয়া উঠে...চক্ষু মুদিলেই দেখিতে পায়, উত্তরা নিঃশব্দে আসিয়া তাহার সম্মুখে বলিতেছে : "আমাকে কেন এত দূরে রাখিয়াছ...কাছে লও।"

নিশীথ উন্মাদের মত ঘুরিতে লাগিল। বিন্দি দাসী ফিরিয়া আসিয়াছে সুস্থ হইয়া। পরেশ সরকারও একটীমাত্র বাহু বিসর্জ্জন দিয়া সুস্থ শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছে, ফিরে নাই সে...

উটরাম ঘাটের ধারে বসিয়া নিশীথ একদৃষ্টে গঙ্গার দিকে চাহিয়াছিল, সহসা তাহার পিঠের উপর কে হাত রাখিয়া ডাকিল, আরে নিশীথ যে? কী ব্যাঁপার? এত সেন্টিমেণ্টাল হলে কবে থেকে? কাব্য লিখচো নাকি?

নিশীথ মুখ ফিরাইয়া দেখিল তাহারই বন্ধু শ্যামল রায়... মাধবীর সম্পর্কীয় দাদা!

নিশীথ অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে দেখিয়া শ্যামল তাহার পাশে বসিয়া কহিল, আচ্ছা ইডিয়ট তুমি...। তোমার মতন বন্ধুকে পরিত্যাগ করাই ভাল, তুমি যে এমন

করে তোমার প্রতিশ্রুতির অপলাপ করবে, অন্ততঃ আমরা তা ভেবে দেখিনি।

নিশীথ মুখ তুলিয়া অপরাধীর মত কুন্ঠিতস্বরে কহিল, শ্যামল তুমি যে আমায় এ কথা বলবে তা জানি আমি। কিন্তু আমার সব কথা হয়তো তুমি জানো না। তোমরা শুনেছিলে আমি ফুলের মালা গলায় দিয়ে, টোপর পরে মনের আনন্দে আর একটী মেয়েকে বিয়ে করেছি। হাঁ তাকে—তোমরা যাকে বল বিবাহ, পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে বিবাহ; —তাই করেছিলুম, কিন্তু তাকে আমি একদিনের জন্যেও পত্নীত্বের অধিকার দিইনি, শ্যামল সে দেবী···উত্তরা তবু হাসিমুখে বলেছিল, আমি এর পরেও যাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারি। তার হৃদয়ের পরিচয় তখনও পাইনি, জানতুম মেয়েরা অতিরিক্ত সেন্টিমেণ্টাল, ও-রা সেন্টি-মেণ্টের বশে চলে, এবং বলে, কিন্তু—শ্যামল, এই যে এতবড় একটা ট্রেণ কলিসান হয়ে গেল জানো?

—জানি না আবার, কিন্তু তুমি কি বলচো নিশীথ? তোমার স্ত্রী কি—?

বাধা দিয়া মৃদুকণ্ঠে নিশীথ কহিল, সে নেই শ্যামল, হয়তো স্বর্গ বলে যদি কোনও বস্তুর যথার্থ অস্তিত্ব থাকে—তিনি গিয়েছেন সেখানে ···"

তরঙ্গায়িত গঙ্গাবক্ষে রক্তিম আকাশের আন্দোলিত প্রতিচ্ছায়া দেখিতে দেখিতে একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্যামল কহিল, মাধবী কেমন আছে, কই সে কথাটা যে জিগ্যেস করলেনা নিশীথ?

নিশীথ উচ্ছ্বসিত জলরাশির দিকে চাহিয়া ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, আমাকে ক্ষমা কোরো শ্যামল, যে কথা জিগ্যেস করবার মত মুখ আমার নেই। আমি সবার কাছেই অপরাধী···আমার অপরাধের সীমা নেই···। কিন্তু তিনি কি—

– হ্যাঁ, তিনি আজও তোমার প্রতীক্ষা করে জীবন-পাত করছেন, সাধে কি বলচি তুমি একটা আস্ত ইডিয়ট···। কতটা অন্যায় করেছ, তা একবার কি ভেবে দেখেছ নিশীথ ?

নিশীথ শ্যামলের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া কহিল, কিন্তু আমি এখন কি করতে পারি, শ্যামল ?

শ্যামল উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল, তা-ও তোমাকে বলে দিতে হবে ? হায়রে একাল! সেকালে সত্যরক্ষার জন্যে বড় বড় রাজা মহারাজারা নিজের দেহ টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাটতেন। তোমাদের এ যুগের পুরুষরা বুঝি মেয়েদের মন নিয়ে খেলা করতেই শিখেছেন ? নইলে নিজের স্ত্রীটীকে তো এত মনঃকষ্ট দিলে। সে বেচারী তোমার মত পাষণ্ড'র হাত এড়িয়ে তো বেঁচে গেছেন, এখন এ মেয়েটীকেও বাঁচাবে ? না, ব্রাহ্ম বলে নাসিকা উত্তোলন করে—

বাধা দিয়া নিশীথ অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, আঃ শ্যামল, একটু আস্তে কথা কও···কিন্তু আমি তো তা বলচি না শ্যামল, সেদিক থেকে আর আমি আপত্তির তুলবো না···তবে—

শ্যামল চঞ্চলকণ্ঠে কহিল, তবে-টবে রেখে দাও নিশীথ, একটা জীবনকে তুমি নষ্ট করেছ···তুমি কি বলতে চাও, তোমার জন্যে

আর একটী মেয়ের জীবনও এমনি করে নষ্ট হয়ে যাবে? তা হ'লে তখন তুমি ও-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে কেন? তোমার সে ভালবাসাটা তাহ'লে সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র···মনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ঘটে নি।···ইস্ মেয়েরা কী বোকা, এযুগে জন্মেও তারা বুঝতে পারে না পুরুষের ভ্রমর বৃত্তি···নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের পায়ে লুটিয়ে পড়ে! ছিঃ!

মুখখানা বিকৃত করিয়া শ্যামল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা আবার কালচারের বড়াই করি!

শ্যামলের কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া স্খলিত গলায় নিশীথ কহিল, যা বলচো শ্যামল, সবই বুঝেছি। সত্যিই আজ আমি এতবড় পৃথিবীতে নিজেকে বড় একা মনে করছি। চার দিক আমার শূন্য লাগচে। কিন্তু এত শীগগীর—না ভাই, অন্ততঃ কিছুদিন আমাকে একটু ভাবতেও সময় দাও। আমার যখন মন চাইবে তখন আপনিই ছুটে যায় মাধবীর কাছে। উত্তরাকে তুমি কিন্তু দেখোনি শ্যামল, দেখলে বুঝতে—সে কতখানি কষ্ট বুকে চেপে হাসিমুখে ঘুরে বেড়িয়েছে···কাউকে তার মনের ব্যথা জানতে দিত না পাছে—

একটি ছোট্ট তপ্ত শ্বাস, নিশীথের অন্তর মথিত করিয়া বাহির হইয়া গেল, তার কণ্ঠের স্বর ক্রমশঃ মৃদুতর হইয়া আসিল।

শ্যামল মায়াতুর দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যে মেয়েটিকে সে কোনদিন দেখে নাই, তারই সকরুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে মমতায় তারও নয়নে অশ্রু আসিয়াছিল।

এগারো

উত্তরা এত করিয়াও দিবাকরের স্ত্রী তরঙ্গিণীর মন পাইল না।

পাড়াগাঁর অল্প শিক্ষিতা মেয়ে যেরূপ হইয়া থাকে। ভাল কথা দুই চারিটা কহিতে না জানুক মন্দ কথা বা পরনিন্দার রসনায় স্বয়ং বাগ্‌দেবী অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। তরঙ্গিণীর প্রথমতঃ কাজই হইল উত্তরার অন্তরের ক্ষতস্থানে আঘাত করা—খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রত্যেকটী কথা জানিয়া লওয়া, স্বামী; সংসার কে বা কাহারা কিরূপ ইত্যাদি। উত্তরা কোন প্রশ্নের উত্তর দিত; কোনটা বা সংক্ষেপে সারিত। তরঙ্গিণী তীক্ষ্ণগলায় কহিত এ-যে তোমার অদ্ভুত আবদার ভাই। স্বামী থাকতেও তুমি চাকরী করে খাবে? এই বয়সে তোমার মত মেয়ে—বলে প্রাণে কত সাধ-আহ্লাদ, চাকরী করবে কি গো? এদিকে তো বল যে শশুর খুব বড়মানুষ, তাঁদের এতে মুখ পুড়বে না?

উত্তরা ধীরগলায় কহিত, কিন্তু তাঁরা তো জানেন না যে আজও আমি বেঁচে আছি! বেশতো তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, কেন তাঁদের সুখের ভিতর হানা দেই দিদি…তুমিতো জানো না…!

উত্তরার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠে, তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া উপরে উঠিয়া যায়, তরঙ্গিণী ঘন ঘন তরকারীতে খুন্তি চালাইয়া মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া কহেন, সবই যেন বিবিয়ানা …চালচলন দেখলেতো ভয় করে…।

এদিকে উঠিতে বসিতে তরঙ্গিণী দিবাকরকে কটূক্তি করে, তোমারও একটু লজ্জা নেই, অতবড় সোমত্ত মেয়ে বাড়ীতে পুষে রেখে দিয়েছ—লোকে যে ছিঃ ছিঃ করছে। দাও ও-কে শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে, না হয় যে চুলোয় যেতে চায়; যাক। ও আপদ আমি ঘরে রাখতে পারবো না!

বিব্রতগলায় দিবাকর উত্তর দেয়, ও-তো তোমার কোন ক্ষতি করেনি তরু…নিতান্ত নিরাশ্রয়…তার ওপর কি রকম রুগ্ন্‌ দেখচোতো·· নইলে উত্তরা তো নিজে হ'তেই চলে যেতে চেয়েছিল।

ঝঙ্কার করিয়া তরঙ্গিণী কহিল, এত দরদ তোমার, ওর ওপর? তাইতো বলি, আজ আমার চোদ্দ বছর বিয়ে হয়েছে কখনো তোমার মুখ থেকে একটা মিষ্টি কথাও শুনতে পাইনি···পোড়া কপাল, সুন্দর মুখকি আর কোথাও দেখোনি?

দিবাকরের সুগৌর মুখ অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। চীৎকার করা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ, তাই কিছুক্ষণ তরঙ্গিণীর ঈর্ষা কুটিল মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত কণ্ঠেই কহিল, একটু সংযত হ'য়ে কথা বলতে শেখো, তরু। একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে যা-তা ব'লো না। চিরকাল গ্রামের ছোট্ট গণ্ডীটুকুর ভেতরেই

কাটালে...বাইরের জগতটা যে কেমন, একবার তার পরিচয়ও নিতে চেষ্টা করো নি...। তাই জানো না যে মানুষের কত অভাব, কত দুঃখ...। শুধু তোমরা বিচার করো বাইরেটুকু দেখে...। শিক্ষা দীক্ষা যদি কিছু তোমার থাকতো, তাহ'লে এর কুৎসিত কথাটা তোমার মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরুত না।

দিবাকর খাইতে বসিয়াছিল, জলের গ্লাসে হাত ডুবাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তরঙ্গিণী অবাক নয়নে চাহিয়া কহিল, ও আবার কি হ'ল? খেলে না যে?

—খুব খেয়েচি তরু। মানুষকে খেতে দিয়ে যা বচনসুধা পরিবেশন করেছ, তাতেই আমার পেট ভরে গেছে। আর প্রবৃত্তি নেই।

তরঙ্গিণীর মুখে যেন শ্রাবণের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। মণ্টু আর ঝুলি দিবাকরের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট থালার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া নাকিসুরে কহিল, মা, এগুলো সব আমরা খেয়ে ফেলি? ও-মা, ব'লো না!

তরঙ্গিণী ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে কহিল, খাও রাক্ষসগুলো, ওগুলো কেন, আমাকেও খাও, বাড়ীর আপদ চুকে যাক।

দিবাকর একবার স্ত্রীর রোষারুণ মূর্ত্তির দিকে কটাক্ষ করিয়া ধীর পায়ে বারান্দা ত্যাগ করিয়া আপনার কক্ষের উদ্দেশ্যে চলিল।

বারান্দার একপার্শ্বে উত্তরা প্রস্তর গঠিত প্রতিমার মত দাঁড়াইয়াছিল।

তরঙ্গিণীর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরই উচ্চ, তাহার উপর দিবাকরের উপর ক্রোধে চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছিল। উত্তরার কানে একটী একটী করিয়া প্রত্যেকটি কথাই অগ্নিময় রূপ ধরিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

দিবাকর উত্তরার সেই সর্ব্বহারার মত দীন মূর্ত্তি দেখিয়া নিকটে গিয়া সস্নেহে ডাকিল উত্তরা···তোমার বৌদির আর কিছু গুণ না থাক, জিবের খুব ধার আছে, নয় ?···ছিঃ, ওর কথা মনে করে দুঃখ পেওনা দিদি, মনে করে দেখো ; সহ্যগুণ কি আমারই কম ?·· ওই কথার বিষে অহোরাত্র জ্বল্‌চি···উপায় নেই উত্তরা, হিন্দু বিয়েতে ডাইভোর্স চলে না, বড় কঠিন বাঁধন···। এক এক সময় মনে হয় দূর হোক ছাই, কিসের স্ত্রী-পুত্র সংসার, সব ছেড়ে-ছুড়ে লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি হিমালয় কি বদরিকার উদ্দেশ্যে···কিন্তু তাও পারি না ! লক্ষী দিদি আমার, ওর কথায় রাগ ক'রোনা, কেমন !

উত্তরা রুক্ষ চুলগুলি কপাল হইতে সরাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, রাগ করিনি তো দাদা, আমি জানি···কিন্তু আর নয় এবার আমায় যেতে দিন, আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছি।

পথ খুঁজে পেয়েছ ? কোথায় তুমি যেতে চাও উত্তরা ?

দিবাকর প্রসন্ন গলায় কহিল।

উত্তরা মুখ নীচু করিয়া কহিল আমার স্বামীর কাছেই ফিরে যাব।

—সে তো সুখের বিষয় উত্তরা; কবে যেতে চাও বলো, আমি

নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, নইলে তোমার শরীরতো এখনও সম্পুর্ণ সুস্থ হয় নি উত্তরা, কি করে একা যাবে ?

—বেশ যেতে পারবো, আপনি আমায় শুধু অনুমতি দিন ! আমি না গেলে আপনার সংসারেও শান্তি হবে না দাদা···আর তাছাড়া আমারও তাঁদের দেখবার জন্যে মন বড় অস্থির হয়েছে···

উত্তরার গলার স্বরে কান্নার আভাস পাইয়া দিবাকর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ।

অভিযোগ করিবার কিছুই নাই, উত্তরা যাহাদের আপন, তাহাদের স্নেহময় ক্রোড়েই ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, উত্তরাকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই ।

দিবাকর কতক্ষণ পরে কহিল, আচ্ছা যেও উত্তরা ··কিন্তু একা নয়, সাধনকেও অন্ততঃ সঙ্গে নিও···নইলে এ অবস্থায় আমি কিছুতেই তোমাকে—

দিবাকরের দীর্ঘ মূর্ত্তি ঘরের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল । উত্তরা চক্ষু মুছিয়া কহিল, পাছে তোমার উন্নত চরিত্রে কালীর আঁচর পড়ে,তাইতো বিদায় নিচ্ছি···নইলে এই স্নেহের আশ্রয় ছেড়ে যেতে আমারও কি মন লাগছে !

চলিয়া সে যাইবেই । কিন্তু কোথায় যাইবে, শরীর যে একপদও অগ্রসর হইতে অশক্ত···চলিতে ফিরিতে বুকের ভিতর ব্যথা বাজে, কি করিয়াই বা যাইবে, কিন্তু এখানে বসিয়া তরঙ্গিণীর তীক্ষ্ণ কটুক্তি তো আর শুনিতে পারা যায় না ।

মণ্টু আসিয়া তাহার কোলের উপর ঝাপাইয়া পড়িল পিসিমা।

উত্তরার সমস্ত অভিমান গলিয়া জল হইয়া গেল। মণ্টুকে বুকের ভিতর সজোরে চাপিয়া সে উত্তর দিল, কি মাণিক?

মণ্টু ওষ্ঠ ফুলাইয়া কহিল, পিসিমা, মা আমাকে আর ঝুলিকে খুব মেরেছে, আর ভাত খায়নি, ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে।

উত্তরার সমস্ত মন দুরপণেয় গ্লাণিতে ভরিয়া উঠিল, ছিঃ, সে কি মূর্ত্তিমতী একটা দুগ্রহ···যে স্থানে যাইতেছে, সেই স্থান জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে তাহার অদৃষ্টে কি এতটুকুও শান্তি নাই।

মণ্টুকে সান্ত্বনা দিয়া উত্তরা কহিল, চলতো মাণিক, তোমার মাকে খাইয়ে আসি···। দেখি, কোথায় তিনি আমার মণ্টু সোণাকে মেরেছেন?

মণ্টু জলভরা চোখে কহিল, এই দেখুন না, আমার গাল কি রকম ফুলে উঠেছে। উত্তরা সবিস্ময়ে দেখিল মণ্টুর কচি কোমল গণ্ডে পাচটী আঙ্গুলের ছাপ···সুস্পষ্ট···আহা···এমন মায়ের প্রাণ···। এই মার যে কাহার উপর ঈর্ষার বিষে দগ্ধ হইয়া মণ্টুর গালে চিহ্ন রাখিয়াছে তাহা বুঝিতে আর উত্তরার বিলম্ব ঘটিল না।

উত্তরা একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

উজ্জ্বল মেঘমুক্ত স্বচ্ছ-নীলাকাশ, কোথাও এতটুকু মলিনতার

আভাস নাই, কিন্তু উত্তরার অন্তর কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকারময়ী রাত্রির মত ? এতটুকু আলোক চিহ্ন সেথায় নাই !···

··· ··· ···

রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিতে করিতে উত্তরা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল ঃ বৌদি !

ভিতর হইতে কোনও সাড়াই আসিল না। উত্তরার পদদ্বয় কাঁপিতেছিল, ধনীর দুলালী, শ্বশুরের বড় স্নেহের পুত্রবধূ···আজ ভাগ্য দোষে···

উত্তরা আবার আঘাত করিয়া কোমল কণ্ঠে কহিল, বৌদি, দরজাটা খুলুন না। ভিতর হইতে খিল খুলিয়া গেল। তরঙ্গিণী শিথিল বস্ত্র সংযত করিতে করিতে সরোষে কহিল, বাপরে বাপ··· একটু নিশ্চিন্তি হ'য়ে শোবার যো নেই, কেবলি ডাকাকাকি···কি দরকার তোমার বলতো ?

উত্তরা রুদ্ধস্বরে কহিল, খাবেন আসুন, বেলা যে অনেক হয়ে গেল। তরঙ্গিণী মুখ ঝামটা দিয়া কহিল, গেল গেলই, তাতে তোমার কি, এইতো এতক্ষণ গুজগুজ ফুস্‌ফুস্ করে এলে···আবার কি মতলব··· ? এতই যদি জান্‌তুম, তাহ'লে কি আমি এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতুম···। বেঁচে থাক আমার ভাই-ভাজ ; সেখানে গেলে রাজার হালে থাকবো।···

উত্তরার দুইটী চোখ মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিল, অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল, বৌদি, তোমার অনুমান যে কত ভুল, তা পরে জানতে পারবে। তোমার স্বামীর চরিত্র নিস্কলঙ্ক···তিনি

আমাকে ছোট বোণের মতই স্নেহ করেন শুধু, এর মধ্যে কদর্য্যতার চিহ্ন মাত্রও নেই। নিজের স্বামীকে তুমি আজও চিনতে পারোনি বৌদি, মিথ্যে তোমরা ভালবাসার বড়াই কর। আর আমি আজই আমার স্বামীর কাছে চলে যাব ভাই···তোমার গলগ্রহ হ'য়ে আর থেকে তোমাদের অশান্তি বাড়াবো না···। খেয়ে নাও, ছেলেপুলের সংসার, তোমারই ভালর জন্যে বলচি ভাই, রাগ করো না···

এতগুলি কথা বলিয়া উত্তরা হাঁফাইতে হাঁপাইতে বুক চাপিয়া অতিকষ্টে মাটির উপর বসিয়া পড়িল। তাহার পর তরঙ্গিণীর বিস্মিত দৃষ্টির সহিত চোখ মিলাইয়া ভারী গলায় কহিল, স্বামীকে একটু বিশ্বাস করতে চেষ্টা কোরো বৌদি, তাহ'লে কোনও গোলোযোগই আর থাকবে না ; সুখের সংসার আনন্দে ভরে যাবে।··

তরঙ্গিণী উত্তরার মুখের পানে বোকার মত চাহিয়া রহিল···। উত্তরা যাহা বলিতেছে তাহা কি সত্য···, সত্যই কি তাহার স্বামীর চরিত্র অকলুষিত···আর ওই মেয়েটী !

বারো

পাতলা একখানি সাদা শালে সমস্ত দেহ ঢাকিয়া মাধবী ঝুলবারান্দার উপর বসিয়া রবি ঠাকুরের সঞ্চয়িতার পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিল অন্যমনস্কের মত। তাহার মুখখানি শুষ্ক ফুলের মতই ম্লান···যেন হেমন্তের বিষণ্ণ অপরাহ্ন···

বারান্দায় পদশব্দ হইতেই মাধবী চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, শ্যামল। শ্যামলকে দেখিয়া মাধবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, তুমি কবে এলে শ্যামল দা? মামীমা, সুধা, রাণু, গিনি, সব ভালো আছে তো?

শ্যামল একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া কহিল, স-ব ভালো আছে, এবং আছেন। কিন্তু তোমায় এ কি দেখছি মাধু···দুষ্মন্তের বিরহে একেবারে শীর্ণা শকুন্তলার মত এ যে নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে বসেছ···। এ তো ভালো কথা নয়।···

মাধবী শীর্ণমুখে একটু ম্লান হাসি ফুটাইয়া কহিল, সত্যি না কি। এত বাজে কথাও তুমি কইতে পারো শ্যামল দা···যাক্, চাকরী তো কচ্ছ···বিয়ে করবে কবে বলতো?

—বিয়ে! হাসালে মাধু! বিয়ে আবার মানুষে করে নাকি! বিয়ে করবে কা-রা? যাদের মাসিক আয় পাঁচশোর কাছাকাছি···বাড়ী আছে, গাড়ী আছে···অভাব-অভিযোগ নেই; বিয়ে করবে তারা···আমার মত পঞ্চাশ টাকা মাইনের খবরের কাগজের এডিটর, সে আবার বউ আনবার স্বপ্ন দেখবে কি করে ভাই! সারারাত্রি জেগে ভোরে ঢুলতে ঢুলতে এসে কি গৃহ-লক্ষ্মীর প্রেমালাপ শুনবো?

মাধবী কুন্দদন্তে অধর চাপিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল; শ্যামলদার দেখছি গৃহলক্ষ্মীদের সম্বন্ধে ধারণাটা খুব উচ্চ···হ্যাঁ ভাই শ্যামলদা, পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে বুঝি একটা মাত্র মানুষের খরচ যোগানো যায় না?

না ভাই, তাঁদের প্রসাধন সামগ্রী যোগাতেই ওই পঞ্চাশটা টাকা দু'হপ্তায় নিঃশেষ হয়ে যাবে···তা পেটেই খাব কি, আর সিনেমাই বা দেখবো কি করে।···আজকালকার মেয়েদের দেখছি তো, কথায় কথায় সিনেমা-থিয়েটার আর—

মাধবী কৃত্রিম রোষে ওষ্ঠ ফুলাইয়া কহিল, এ যুগের মেয়েদের দোষ দিও না শ্যামলদা, তাদের গড়ে তুলচো তোমরাই, ঘর থেকে বাইরে টেনে আনচো তোমরাই হাত ধরে···। ঘরের লক্ষ্মীঠাকুরুণকে হাই হীল জুতো, আর জর্জ্জেট সাড়ী পরিয়ে টেনে নিয়ে যাও নাচের সভায়, তোমরাই। তাদের গান আর নাচ দেখে আর শুনে বাহবা দিয়ে তোমরাই তাদের অহমিকা বাড়িয়ে দাও শ্যামলদা, তোমাদের দোষ এগুলো, শুধু শুধু মেয়েদের নামে

অপবাদ দিও না। তাদের কি শুধুই দোষ আছে শ্যামলদা, গুণ কি কিছুই নেই ?

শ্যামল কৌতুকভরে কহিল, মাধবী ক্ষমা কর ভাই, আর কক্ষনো হাল-আমলের মেয়েদের নামে দোষ দেব না। কিন্তু একটা কথা ভাই অস্বীকার করো না, একালের মেয়েরা, মানে তোমরা যতই কালচারের গুমোর কর না কেন, অন্তরে অন্তরে তোমরা সেই আদিকালের সরলা অবলা এবং দুর্ব্বলা নারী ছাড়া আর কিছুই নও। এ তোমাদের জন্মগত সংস্কার···যুগে যুগে রক্তের ধারার সঙ্গে বয়ে আসছে! যতই তোমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ, বি, এ ডিগ্রী পাও না কেন···অন্তরে এক জায়গায় তোমরা সেই স্নেহ দুর্ব্বলা নারীই আছ।···

মাধবী উৎসুক হইয়া কহিল, তার মানে, শ্যামলদা ?

শ্যামল মিটমিট করিয়া চাহিয়া হাসিমুখে কহিল, বলতেও যে ভরসা হয় না ভাই···আবার হয়তো—

মাধবী আরক্ত মুখে কহিল, না না ভণিতা কর্চ্ছ কেন শ্যামলদা, বলেই ফেল না কেন।

শ্যামল মৃদু-স্বরে কহিল, এই ধরনা কেন, তুমি···কবে কোথায় কি হ'ল, আর সেই থেকে তুমি সঙ্কল্প করে বসলে আর বিয়েই করবো না। এ-টা কি তোমার ভালো হচ্ছে ?

মাধবীর মুখ হইতে ব্লটিং কাগজ দিয়া অকস্মাৎ কে যেন সমস্ত রক্ত শুষিয়া লইল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মাধবী কহিল, মেয়েদের বিয়ে কবার করে হয়, শ্যামলদা, বলতে পারো ?

শ্যামল অতিরিক্ত চমকিত ভাবে কহিল, সে কি মাধু? নিশীথের সঙ্গে কি তোমার বিয়ে হ'য়ে গেছে নাকি? কই, কিছু শুনিনি তো?

মাধবী ধীর স্বরে কাহল, উৎসব-অনুষ্ঠানের ভেতর সে বিয়ে হয়তো হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরের চোখে আমরা বিবাহিত ছাড়া কিছু নয়।

শ্যামল গম্ভীর-ভাবে কহিল, সে হ'ল হিন্দু···আর তুমি ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে। এ অবস্থায় ভেবে দেখেছ, তোমাদের এ বিয়ে হলে তোমার বাবার কতখানি মনে লাগবে।

মাধবী স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, বাবার অনুমতি আমি অনেক আগেই পেয়েছিলুম, শ্যামল দা···আর তা ছাড়া একটা কথা সব চেয়ে বড় শ্যামল দা, প্রেম যেখানে সব থেকে বড় মন্ত্র, সেখানে তো অন্য মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না···দুইটী আত্মা যখন পরস্পর মেশে, তখন কি সে ভেবে দেখে যে দু'জনার মধ্যে জাতিগত বা বংশগত প্রভেদ আছে কি-না?

শ্যামল উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, তুমি আমায় আশ্চর্য্যি করলে মাধু···তুমি যে এমন চমৎকার ভাবে কথা বলতে পারো— জান্তাম না···! ভেবেছিলুম এ যুগের মেয়েরা শুধু গ্রন্থ সর্ব্বস্ব··· অপদার্থ···! খালি লম্বা লম্বা লেকচার দিতেই মজবুত···কিন্তু, নাঃ, তোমাকে দেখে আমার আনন্দ লাগচে ভাই···

মাধবী কোমল-কণ্ঠে কহিল, শ্যামল দা, মেয়েরা ঠিকই আছে, তোমাদের পরিবর্ত্তনশীল মনের অনুযায়ী তারা নিজেকে গড়ে

তুলচে, মাত্র এইটুকু প্রভেদ···। তোমরা যখন তাদের কুঁড়ে ঘরে শাঁখা সিঁদুর পরা লক্ষ্মী মূর্তিতে দেখতে চাইতে, তখন তারা সেইভাবেই নিজেকে তৈরী করতো, এখন তোমরা শুধু শান্ত শিষ্ট লক্ষ্মী প্রতিমা চাও না, চাও আধুনিক মূর্তিমতী স্বরস্বতীকে—অর্থাৎ নাচে, গানে...কাব্যে সাহিত্যে সব দিকে একেবারে সুপটু··। তাই তারাও তোমাদের প্রীত্যর্থে নিজেকে ভেঙ্গে চুরে গড়চে।

শ্যামল কহিল, কিন্তু, একটা সংশয়ের সুর বাজবে মাধবী, নিশীথ তো অকৃতদার নয়, শুনচি সে না কি বিয়ে করেছে ?

মাধবী স্মিত মুখে কহিল, ক'রেচেন তা আমিও জানি। তাতে কি শ্যামল দা, জীবনটা কদিনের জন্যে ভাই···না হয় এ জীবন আমার আশায় আশায় কেটে যাবে...সাধনার যদি জোর থাকে, তাহ'লে আমার তপস্যার ধন আমি কি পর জীবনেও পাব না।···

শ্যামল কহিল, আজ আমি উঠছি মাধু···একটু কাজ আছে, অন্য একদিন এসে এ-সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো।

মাধবী কহিল, মার সঙ্গে দেখা করেছ শ্যামল দা, রাঙা-মাসীমার সঙ্গে ? শ্যামল কহিল, বড় মাসীমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু রাঙা-মাসীমা। ওরে বাস্‌রে, এই মাত্র তোমার সঙ্গে তর্ক করেই একে মাথাটা গোলমাল হ'য়ে গেছে মাধু, তার ওপর রাঙা মাসীমা—না ভাই, এবার আমি উঠছি···আজ আবার নাইট ডিউটী···

শ্যামল উঠিয়া গেল। হাতের বহিখানি মুড়িয়া মাধবী এক-দৃষ্টে রাজপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

আসন্ন সন্ধ্যায় মহানগরী আলোক মালায় সুসজ্জিতা হইয়া উঠিয়াছে। শনিবার। বাস ট্রামগুলি আরোহী পূর্ণ…সুসজ্জিত নর-নারীরা খোলা মোটরে ময়দান অভিমুখে চলিয়াছে…কেহবা সিনেমায়। ইহাদের হাসিমুখ দেখিয়া কে বলিবে দরিদ্র দেশ, আর ততোধিক দরিদ্র এই দেশেরই নগন্য অধিবাসীরা, যাহারা সামান্য চাকুরীজিবী। শ্যামল কি সাধ করিয়া বলিয়া গিয়াছে যে পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় বিবাহ করা চলে না…! বিবাহে আর কাহারও রুচি নাই…সংসার যেন ভয়াবহ মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।…

ঝুল বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইতেই পাশের বাড়ীর একটী কক্ষের দিকে মাধবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। একখানি মাত্র ঘর ভাড়া লইয়া থাকে স্বামী ও স্ত্রী…যেন কপোত আর কপোতী। কয়দিন হইল স্বামীটী হয়তো কোন কাজে বাহিরে গিয়াছেন, এ কয়দিন বধূটী মলিন মুখে আনমনে ঘুরিয়া বেড়াইত, সময় সময় জানালা রেলিংটী চাপিয়া রাস্তার দিকে তৃষাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। এই কয়দিনেই তাহার প্রস্ফুটিত পদ্মের মত মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছিল, আজ সেই বধূটীকে মাধবী দেখিল উৎফুল্ল মনে টেবিল গুছাইতেছে। সমস্ত ঘরখানি অন্তর ঢালিয়া পরিস্কার করিল। আলনাতে ধোয়া সাড়ী দুইখানি ও স্বামীর ধুতিটী কোঁচাইয়া রাখিল। মেঝেটী জল-ন্যাকড়া দিয়া মুছিয়া নির্ম্মল করিয়া

তুলিল। তাহার পর ছোট্ট একখানি আয়না পাড়িয়া চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম লইয়া প্রসাধন করিতে বসিয়া গেল।

ওই বধূটীকে দেখিয়া মনে হইতেছে আজ তাহার দুঃখের বিভাবরী পোহাইয়াছে। দীর্ঘ দিন পরে তাহার প্রিয় আসিতেছে তাই তাহার এই আনন্দ···উচ্ছলিত ঝর্ণার মত বধুটী যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে···আনন্দ তার চোখে মুখে ··আনন্দ তার সর্ব্বাঙ্গে···

মাধবী একটী নিঃশ্বাস ফেলিল। উহারাতো ধনী নহে, তবে উহারা কেন অত সুখী···কই একদিনও তো মাধবী দেখে নাই যে বধূটী স্বামীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনিয়াছে !···

বধূটীর দিকে মাধবী চোখ তুলিয়া চাহিতেই বধুটী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, মাধবীও একটু হাসিয়া সরিয়া আসিল।

বুকের ভিতর যেন কেমন করিতেছে···"এতটুকু খবরও কি দিতে নাই, এত নিষ্ঠুর তুমি নিশীথ, তোমার সুখের সংসারে আমি তো ভাগ বসাইতে যাইতাম না···শুধু কানে শুনিতাম, তুমি ভালো আছ।"

মাধবীর দুই চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিল। নাঃ চিন্তা করিবারও তাহার অবসর নাই···। চায়ের আসরে তাহাকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে, নহিলে মা রাগ করিবেন। ভিতরে আগুন জ্বাললেও মুখে তাহাকে হাসির আবরণ পরিয়া থাকিতে হইবে।

ইহারই কয়েক মাস পরে শ্যামল আসিয়া মাধবীকে একান্তে ডাকিয়া কহিল, মাধু···একটা সুসংবাদ তোমায় দেব, বলতো কী ?

মাধবীর ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসির বিদ্যুত মুহূর্ত্তের জন্য ঝলসিয়া উঠিল : কী সুসংবাদ দেবে শ্যামল দা, তোমার বিয়ের খবর ?

শ্যামল অভিমানের স্বরে কহিল, ঠাট্টা করো না মাধু···শোনো, নিশীথ এসেছে। মাধবী বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল : কে, কে এসেচেন শ্যামল দা ? কোথায় তিনি ? শ্যামল কহিল, বড় মাসীমার ঘরে তাঁকে বসিয়ে এসেছি। তার বিয়ের খপরটাই সবাই জেনেছে মাধু, কিন্তু তার জীবনের সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনার ইতিবৃত্ত তো কেউ শোনোনি !

মাধবী কম্পিত কণ্ঠে কহিল, মা, মাকে তুমি কি সব বলেছ নাকি শ্যামল দা ! কী সর্ব্বনাশ, তুমি দেখছি সব পারো।

শ্যামল হাসিমুখে কহিল, পারি বই কি, তোমাদের মত বোনের জ্বালায় সব কিছুই পারতে হয়। মাধু···নিশীথের অবস্থা দেখবে চলো···তার স্ত্রী ট্রেণ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এ অবস্থায় তুমি নইলে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, মাধু···। তোমারই জন্যে সে তার বিবাহিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করেনি—সেই দুঃখে সেই মেয়েটী —যাক্‌গে, ওকী কাঁদচ মাধু···এত সুখেও তোমার চোখে জল এসেছে !

আঁচলে মুখ মুছিয়া মাধবী সিক্ত গলায় কহিল, এ কান্না তুমি বুঝবে না শ্যামল দা···। চল দেখিগে কোথায় তিনি···।

মাধবী শ্যামলের সহিত কম্পিত বুকে অগ্রসর হইল।···

তেরো

সাধনের কাঁধের উপর ভর দিয়া অতি কষ্টে হাবড়ার ব্রীজ পার হইয়া উত্তরা ক্ষীণ গলায় কহিল, একটুখানি দাঁড়াও ভাই···একবার মা গঙ্গাকে প্রাণভরে দেখে-নি···আচ্ছা সাধন, ডাক্তারবাবু জানতে পেরেছেন এতক্ষণে, যে আমি লুকিয়ে তোমার সঙ্গে চলে এসেছি। তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যে এলে ভাই···একা আমি ঠিক আসতে পারতুম।

সাধন চিন্তিত গলায় কহিল, কি যে বলেন দিদি···এক পা চলতে গিয়ে হাঁফিয়ে পড়ছেন, আর বলছেন একা আসতুম! ভাগ্যিস আমি দেখতে পেলাম, নইলে একাই তো বাড়ী থেকে পালাচ্ছিলেন···! কি দুঃসাহস তোমার দিদি।···আস্তে আস্তে এইখানটায় বসো দেখি, আমি একখানা গাড়ীর সন্ধান করি।···

উত্তরাকে ফুটপাথের এক পার্শ্বে রাখিয়া সাধন গাড়ীর জন্য ভীড়ের ভিতর হইতে অদৃশ্য হইতেই উত্তরা পথের উপর নামিয়া পড়িল। তাহার পা টলিতেছে, বুকের ভিতর টান ধরিতেছে। আশে-পাশে লোকজন···গাড়ী আর মোটর, উত্তরা দুর্ব্বল দেহে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ভোঁ-ও-ও···দূর [হইতে একখানা দ্রুতগামী মোটর আসিয়া

একেবারে উত্তরার পিছনে সজোরে হর্ণ দিল। উত্তরা সশব্যস্তে সরিয়া যাইতেই টলিয়া একেবারে মোটরের সম্মুখে পড়িয়া গেল। ব্রেক কষিতে-কষিতে মোটরের ভারি চাকা তখন উত্তরার দুর্ব্বল বুকখানি পিষিয়া ফেলিয়াছে।

এক মুহূর্ত্ত···এক মুহূর্ত্তে চক্ষের নিমেষে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটিতেই মোটরখানি ঘিরিয়া লোক জমিয়া গেল। কোলাহল আর সমবেদনায় রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিল।

বিহ্বলা মাধবীকে গাড়ীর ভিতরে রাখিয়াই নিশীথ মোটর হইতে লাফাইয়া পড়িল। ততক্ষণে উত্তরার রক্তাক্ত দেহ মোটরের তলা হইতে টানিয়া সাধন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিতেছে, উত্তরা দিদি··· দিদি • একী করলে, কেন তুমি রাস্তায় নেমে এলে দিদি !

উত্তরা !···

নিশীথের গায়ের রক্ত যেন জমিয়া বরফ হইয়া গেল। ভীড় ঠেলিয়া সে হাঁটু গাড়িয়া উত্তরার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। উত্তরাই তো···সেই প্রশান্ত ডাগর চক্ষু দুইটী···অর্দ্ধ নিমীলিত···মাথার এক পাশ কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে, চুলের ফাঁকে ফাঁকে তাজা লাল রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

চারিদিকে পুলিশ কর্ম্মচারিরা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিস্মিত জনতা অবাক হইয়া দেখিল, নিশীথ স্বয়ং জানু পাতিয়া বসিয়া উত্তরার নিশ্চল দেহখানি বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহার দুইটী চক্ষে অজস্র অশ্রু।

——:•:——